স্কুলের নাম পথচারী

১

তোমরা মনে করতে পার এই গল্পটা বুঝি বানানো, কিন্তু আমি আগেই বলে দিই এটা বানানো গল্প না। যে-মানুষগুলিকে নিয়ে এই গল্প তাঁরা নিজেরা আমাকে এই গল্পটা বলেছেন—তাঁরা তো খামোকা আমার কাছে গুলপট্টি মারবেন না! আমার অবিশ্যি নিজে থেকে তোমাদের এই কথাটা বলে দেয়ার কোনো দরকার ছিল, না কারণ তোমরা একটু শুনলেই বুঝতে পারবে এর মাঝে কোনো ফাঁকিজুকি নেই।

যেই মানুষগুলিকে নিয়ে এই গল্প তার প্রথমজনের নাম ফরাসত আলি। ফরাসত আলি মানুষটার মাঝে কোনো মারপ্যাঁচ নেই। তিনি বেশি মোটাও না আবার তিনি বেশি শুকনোও না। তিনি বেশি লম্বাও না আবার বেশি খাটোও না। তিনি বেশি বোকাও না আবার বেশি চালাকও না। তাঁকে যদি তোমরা কোনোদিন রাস্তায় দেখ হয়তো বুঝতেই পারবে না যে মানুষটা ফরাসত আলি। কিন্তু যারা তাঁকে চেনে তাদের বুঝতে কোনো অসুবিধে হয় না, তার এক নম্বর কারণ ফরাসত আলির একটা মজার অভ্যাস আছে। প্রত্যেক বছর যখন খুব গরম পড়ে ফরাসত আলি তখন চুল-দাড়ি কামিয়ে পুরোপুরি ন্যাড়া হয়ে যান, তখন তাঁকে দেখায় মুসোলিনির মতো। আবার যখন শীত পড়তে শুরু করে তখন তিনি দাড়িগোঁফ কামানো বন্ধ করে দেন আর তখন তাঁকে দেখায় কার্ল মার্ক্সের মতো।

গত বছর শীতের শেষে যখন গরম পড়তে শুরু করেছে তখন একদিন ফরাসত আলির চুল-দাড়ি কুটকুট করতে শুরু করল, তিনি বুঝতে পারলেন তাঁর চুল-দাড়ি কাটার সময় হয়েছে। তখন-তখনই তিনি তাঁর নাপিতের দোকানে রওনা দিলেন, গিয়ে দেখেন সেখানে লম্বা লাইন। কোনো কারণে সবাই সেদিন চুল কাটতে এসেছে। কতক্ষণ আর ফরাসত আলি বসে থাকবেন তাই তিনি দোকানে গেলেন একটা রেজর কিনতে।

বড় মনোহারী দোকান, খদ্দেরের খুব বেশি ভিড় নেই। ফরাসত আলি দোকানিকে বললেন, "ভাই, ভালো দেখে একটা রেজর দেন দেখি।"

দোকানি মানুষটা অবাক হয়ে বলল, "সত্যি?"

ফরাসত আলি ঠিক বুঝতে পারলেন না দোকানি এত অবাক হল কেন, তবুও মাথা নেড়ে বললেন, "সত্যি।"

দোকানি তার বাক্স খুলে কী-একটা কাগজ বের করে সেখানে কীসব লেখালেখি করতে শুরু করল। ফরাসত আলি ঠিক বুঝতে পারলেন না কী হচ্ছে, তবু তিনি ধৈর্য ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন। দোকানি অনেকক্ষণ লেখালেখি করে তাঁকে কয়েকটা কাগজ ধরিয়ে দিয়ে বলল, "এই যে নেন, একশোটা।"

"একশোটা কী?"

"লটারির টিকেট।"

ফরাসত আলি অবাক হয়ে বললেন, "লটারির টিকেট?"

"হ্যাঁ। একটা পাঁচ টাকা করে একশোটার দাম পাঁচশো টাকা।"

ফরাসত আলি ঠিক বুঝতে পারলেন না কী হচ্ছে, তিনি মাথা নেড়ে বললেন, "কিন্তু লটারির টিকেট কেন?"

দোকানি অবাক হয়ে বলল, "এই যে আপনি চাইলেন!"

"আমি চাইলাম?"

"হ্যাঁ।"

"কখন?"

"এই তো এক্ষণি। বললেন একশোটা লটারির টিকেট।"

"মোটেই না! আমি বলেছি রেজর। দাড়ি কামানোর রেজর।"

দোকানি চোখ কপালে তুলে বলল, "রেজর? আপনি মোটেও রেজর বলেননি। বলেছেন একশোটা লটারির টিকেট।"

ফরাসত আলি মুখ শক্ত করে বললেন, "আমি বলি নাই।"

"বলেছেন।" দোকানি তখন আশেপাশে দাঁড়ানো লোকজনকে সাক্ষী মানতে শুরু করল, "ইনি বলেছেন না?"

উপস্থিত লোকজন তিন ভাগে ভাগ হয়ে গেল। এক ভাগ বলল, বলেছেন, এক ভাগ বলল বলেন নাই, অন্য আরেক ভাগ বলল, তিনি হয়তো বলেছেন 'রেজর' কিন্তু তাঁর মুখে এত দাড়ি-গোঁফ থাকায় সেটা শোনা গেছে 'লটারির টিকেট'। সেটা কীভাবে সম্ভব ফরাসত আলি ঠিক বুঝতে পারলেন না, কিন্তু তিনি সেটা নিয়ে মাথা-ঘামালেন না। খুব গম্ভীর হয়ে বললেন, "ঠিক আছে ,আমি কী বলেছি আর আপনি কী শুনেছেন সেটা নিয়ে তর্ক করে লাভ নেই। আমি লটারি খেলি না, আমার লটারির টিকেটের দরকার নেই। আমাকে আমার রেজর দেন, আমি যাই।"

দোকানি মুখ কালো করে বলল, "কিন্তু লটারির টিকেট সাইন হয়ে গেলে ফেরত নেওয়ার নিয়ম নেই। এখন এইগুলি আপনাকে নিতেই হবে।"

"কিন্তু আমি লটারি খেলি না।"

"একবার খেলে দেখেন। ভাগ্যের ব্যাপার, লেগে গেলে এক ধাক্কায় তিরিশ লাখ টাকা। তা ছাড়া টিকেট সাইন হয়ে গেছে, এখন তো নিতেই হবে।"

ফরাসত আলি একবার ভাবলেন রেগে যাবেন, কিন্তু তিনি কখনোই বেশি রেগে যান না, তাই এবারেও বেশি রাগলেন না, মেঘস্বরে বললেন, "যদি না নিই?"

দোকানি তখন খুব মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, "তা হলে সবগুলি আমার নিজের কিনতে হবে। আমি গরিব মানুষ, খামোকা এতগুলি লটারির টিকেট কিনে কী করব?"

ফরাসত আলি কী ভেবে লটারির টিকেটগুলি নিলেন। মানিব্যাগে সেদিন পাঁচশো টাকা ছিল, দুদিন আগেই বেতন পেয়েছেন। পাঁচশো টাকা এভাবে বের হয়ে যাবার পর তাঁর সারা মাসে টাকার টানাটানি হয়ে যাবে, কিন্তু এখন কিছু করার নেই। টাকা গুনে ফরাসত আলি যখন বের হয়ে আসছিলেন দোকানি জিজ্ঞেস করল, "রেজর নেবেন না?"

ফরাসত আলি কোনো কথা না বলে মাথা নাড়লেন, তাঁর এখন আর রেজর কেনার ইচ্ছা নেই। তা ছাড়া তাঁর ভয় হচ্ছিল তিনি যদি মুখ ফুটে কিছু-একটা বলেন দোকানি

সেটাকে অন্যকিছু একটা শুনে ফেলে আবার তাঁকে কিছু-একটা গছিয়ে দেবে। তিনি যখন বের হয়ে আসছিলেন দোকানি নরম গলায় বলল, "স্যার, রাগ হবেন না আমার উপর। এই লটারির টাকায় ঘূর্ণিঝড়ের আশ্রয় বানানো হবে। যদি লটারি না জেতেন মনে করবেন সৎকাজে দান করলেন। তা-ছাড়া লটারির টিকেট সবাই কিনতে চায়—আপনি যদি নিজে একশোটা রাখতে না চান বন্ধুবান্ধবের কাছে বিক্রি করতে পারেন, দেখবেন একেবারে ইলিশ মাছের মতো বিক্রি হয়ে যাবে।"

ফরাসত আলি প্রথম কয়েকদিন তাঁর লটারির টিকেট বিক্রি করার চেষ্টা করলেন কিন্তু সেগুলি ইলিশ মাছের মতো বিক্রি হল না। রইসউদ্দিন নামে তাঁর একজন প্রফেসর-বন্ধু আছে, তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "ভুল করে আমি একশোটা লটারির টিকেট কিনে ফেলেছি। তুমি কি কয়টা কিনতে চাও?'

তাঁর প্রফেসর-বন্ধু জিজ্ঞেস করলেন, "নাম্বার কত?"

"নাম্বার?"

"হ্যাঁ।"

"কিসের নাম্বার?"

"লটারির টিকেটে সবসময় নাম্বার থাকে জান না?"

ফরাসত আলি তখন টিকেটগুলি বের করে নাম্বার দেখলেন। প্রথমটার নাম্বার চ-১১১১১১১১। তাঁর বন্ধু রইসউদ্দিন নাম্বারটা দেখে গম্ভীর হয়ে বললেন, "জাল টিকেট।"

"জাল?"

"হ্যাঁ।"

"কেন?"

"কখনো লটারির টিকেটের নাম্বার এরকম হয় না। চ-এর পর আটটা এক এটা অসম্ভব ব্যাপার। আমি অঙ্কের প্রফেসর, আমি এসব জানি। প্রোবাবিলিটি বলে একটা কথা আছে তার নিয়ম অনুযায়ী এটা অসম্ভব।"

ফরাসত আলি সেটা নিয়ে বেশি তর্ক করলেন না। তিনি অঙ্ক ভালো বোঝেন না। পরদিন তাঁর দেখা হল এমাজউদ্দিনের সাথে, এমাজউদ্দিন তাঁর বেশ অনেকদিনের বন্ধু, কাস্টমসে চাকরি করে। ফরাসত আলি বললেন, "আমার কাছে কিছু লটারির টিকেট আছে, ভুল করে কিছু কিনে ফেলেছি। তুমি কি কয়েকটা কিনতে চাও?"

"কত টাকার লটারি?"

ফরাসত আলি মাথা চুলকে বললেন, "মনে হয় তিরিশ লাখ টাকার।"

এমাজউদ্দিন তাঁর বিদেশী সিগারেটে টান দিয়ে বললেন, "মাত্র তিরিশ লাখ? বেশি টাকা না হলে আমি লটারি খেলি না।"

ফরাসত আলি ভয়ে ভয়ে বললেন, "তিরিশ লাখ টাকা বেশি হল না?"

"ধুর! তিরিশ লাখ একটা টাকা হল নাকি? এক দুই লাখ টাকা তো আমার হাতের ময়লা।"

ফরাসত আলির কাস্টমসের বন্ধু এমাজউদ্দিন একটু পরে বললেন, "আর তুমি কেমন করে জান এটা তিরিশ লাখ টাকার লটারি? হয়তো আরও কম।"

ফরাসত আলি মাথা চুলকে বললেন, "কম হওয়ার তো কথা না। একটা টিকেটের নাম্বার চ, তার পরে আটটা এক। এত বড় যদি নাম্বার হয় তার মানে অনেক বড় লটারি—"

এমাজউদ্দিন সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, "এগুলি লোক-ঠকানোর বুদ্ধি— মনে হয় সস্তা লটারি। হাজার দুই হাজার টাকার! হা হা হা—"

ফরাসত আলি তবু হাল ছাড়লেন না। তাঁর একজন ডাক্তার-বন্ধু আছেন, তাঁকেও একদিন জিজ্ঞেস করলেন, "আমার কাছে কিছু বাড়তি লটারির টিকেট আছে ,তুমি কি কিনতে চাও?"

তাঁর ডাক্তার-বন্ধুর নাম তালেব আলি, তিনি হেহে করে হেসে বললেন, "রইসউদ্দিন আমাকে বলেছে, তুমি নাকি অনেকগুলি জাল টিকেট নিয়ে ফেঁসে গেছ! টিকিটের নাম্বার নাকি চ, তার পরে আটটা এক! রইসউদ্দিন অঙ্কের প্রফেসর—আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছে জাল টিকেটে সবসময় এরকম নাম্বার হয়। সত্যিকার টিকেটে নাম্বারগুলি হয় সব সংখ্যা দিয়ে!"

ফরাসত আলি শেষ চেষ্টা করলেন তাঁর অ্যাডভোকেট-বন্ধু আব্দুল করিমের কাছে। আব্দুল করিম মাথা নেড়ে বললেন, "আমার সাথে এমাজউদ্দিনের দেখা হয়েছিল। এমাজউদ্দিন বলেছে এটা নাকি কম পয়সার লটারি, এই টিকেট কেনা মানে মাছি মেরে হাত কালো করা।"

ফরাসত আলি তখন হাল ছেড়ে দিলেন। একবার ভাবলেন রেগেমেগে টিকেটগুলি নর্দমায় ফেলে দেবেন, কিন্তু কী ভেবে শেষ পর্যন্ত ফেললেন না, তোশকের নিচে রেখে দিলেন। সেদিন রাতে তাঁর বন্ধু ফারুখ বখতের সাথে দেখা হল। ফারুখ বখত তাঁর ছেলেবেলার বন্ধু, ভবিষ্যতে কী করবেন সেটা নিয়ে সবসময় চিন্তাভাবনা করেন বলে এমনিতে বিশেষ কাজকর্ম করার সময় পান না। তিনি অসম্ভব শুকনো, মাথার চুলগুলি কোড়োকাকের মতো, মুখে বেমানান অনেক বড় বড় গোঁফ। এমনিতে তাঁকে দেখলে মনে হয় বুঝি অনেক রাগী কিন্তু ফারুখ বখত খুব ঠাণ্ডা মেজাজের মানুষ। ফারুখ বখত আর ফরাসত আলি একেবারে ছেলেবেলার বন্ধু বলে একজন আরেকজনকে তুই তুই করে বলেন। ফরাসত আলিকে দেখে তিনি একগাল হেসে বললেন, "ফরাসত, তুই নাকি অনেকগুলি লটারির টিকেট কিনে ফেঁসে গেছিস?"

"তুই কেমন করে জানিস?"

"সবাই জানে! রইসউদ্দিন বলেছে। এমাজউদ্দিন বলেছে। একটা টিকেটের নাম্বার নাকি চ ১১১১১১১১১?"

ফরাসত আলী মাথা নাড়লেন, বললেন, " হ্যাঁ!"

"একশোটা টিকেট তুই কেন কিনলি?"

ফরাসত আলি তখন তাঁকে সবকিছু খুলে বললেন—কেমন করে তাঁকে লটারির টিকেট কিনতে হল তার পুরো বৃত্তান্ত। সব শুনে ফারুখ বখত বললেন, "মন খারাপ করিস না। ধরে নে টাকাটা দান করেছিস। লটারির টাকা দিয়ে ঘূর্ণিঝড়ের আশ্রয় বানানো হবে, অনেক বড় সৎকাজ।"

"তবুও এতগুলি টাকা খামোকা—"

"ঠিক আছে পঞ্চাশটা আমাকে দিস।"

"পঞ্চাশটা?"

"হ্যাঁ। বাকিতে। এখন পকেটে টাকা নেই, যখন হবে দিয়ে দেব।"

পরের শনিবার ব্যাপারটা ঘটল। অঙ্কের প্রফেসর রইসউদ্দিন সকালে খবরের কাগজ খুলে দেখলেন লটারির ফল বের হয়েছে। প্রথম পুরস্কার তিরিশ লাখ টাকা যে-টিকেটটা

লটারী পেয়েছে তার নাম্বার চ ১১১১১১১১১! চ-য়ের পর আটটা এক। অঙ্কের প্রফেসর দুইবার শুনে মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন।

তাঁর স্ত্রী চোখে মুখে পানির ঝাপটা দিয়ে তাঁর জ্ঞান ফিরিয়ে এনে জিজ্ঞেস করলেন, "কী হয়েছে গো? ব্লাডপ্রেশারটা আবার বেড়েছে?"

রইসউদ্দিন বুক চাপড়ে বললেন, "না গো ব্লাডপ্রেশার না! ত্রিশ লাখ টাকা এই হাতের ফাঁক দিয়ে বের হয়ে গেছে। ত্রিশ লাখ টাকা!"

"কেমন করে?"

রইসউদ্দিন তখন তাঁর স্ত্রীকে সবকিছু খুলে বললেন, শুনে তাঁর স্ত্রী মাথা ঘুরে পড়ে যেতে যেতে কোনোমতে একটা চেয়ার ধরে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, "এখনও সময় আছে—"

"কী সময়?"

"ফরাসত আলি সাদাসিধে মানুষ, এখনও নিশ্চয়ই খোঁজ পায়নি। দৌড়ে তার বাসায় গিয়ে দ্যাখো টিকেটগুলি কিনে আনতে পার কি না—"

"রইসউদ্দিন তখনই ইলেকটিক শক খাওয়ার মতো চমকে উঠে বললেন, ঠিক বলেছ। তুমি ঠিক বলেছ।"

তিনি তখন লাফিয়ে উঠে কোনোমতে জামাকাপড় পরে ছুটলেন ফরাসত আলির বাড়িতে। তাঁর স্ত্রী পিছন থেকে চিৎকার করে বললেন, "খালিহাতে যেও না খবরদার! দুই কেজি মিষ্টি কিনে নিয়ে যেও।"

ফরাসত আলি অনেক দেরি করে ঘুম থেকে উঠে মাত্র এক কাপ চা তৈরি করে চুমুক দিয়েছেন ঠিক তখন দরজায় শব্দ হল। দরজা খুলে দেখেন তাঁর বন্ধু রইসউদ্দিন, হাতে মিষ্টির বাক্স। তিনি অবাক হয়ে বললেন, "আরে প্রফেসর সাহেব! কী মনে করে?"

রইসউদ্দিন আমতা আমতা করে বললেন, "এই তো মানে ইয়ে ভাবলাম অনেকদিন দেখা হয় না—"

"এই তো সেদিন দেখা হল, মনে নেই? লটারির টিকেট—"

"ও! হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ," প্রফেসর রইসউদ্দিন অনেকবার মাথা নেড়ে বললেন, সেদিন তুমি বললে তাই ভাবলাম তোমার কাছ থেকে লটারির টিকেটগুলি কিনেই নিই।"

ফরাসত আলি খুশি হয়ে বললেন, "কিনবে?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, কিনব।"

"কয়টা?"

"তুমি যদি বল তাহলে সবগুলি।"

"সবগুলি?" ফরাসত আলি একটু অবাক হলেন এবং তার হঠাৎ একটু সন্দেহও হল। জিজ্ঞেস করলেন, "সবগুলি কিনবে?"

"হ্যাঁ। এত একটা ভালো কাজের জন্যে লটারি।"

"কিন্তু সেদিন তুমি না বললে জাল?"

"জাল হলে হবে! রইসউদ্দিন উদারভাবে হেসে বললেন, ভালো কাজে জাল-জুয়াচুরির ভয় করতে হয় না।"

ফরাসত আলি বললেন, "ঠিক আছে তুমি যদি কিনতে চাও কেনো।" তিনি গিয়ে তাঁর তোশক তুলে দেখলেন টিকেটগুলি নেই। তখন মনে পড়ল দুদিন আগে তোষকগুলি রোদে দিয়েছিলেন, তখন লটারীর টিকেটগুলি বের করে একটা বইয়ের মাঝে

রেখেছিলেন। কোন বইয়ের মাঝে রেখেছিলেন সেটা এখন মনে করতে পারলেন না। ফরাসত আলি খানিক্ষণ কয়েকটি বইয়ের মাঝে খুঁজে হাল ছেড়ে দিয়ে বললেন, "ধুর, এখন খোঁজাখুঁজি করতে ইচ্ছে করছে না। তুমি বিকেলবেলা এসো আমি খুঁজে বের করে রাখব।"

রইসউদ্দিন ফরাসত আলির দুই হাত ধরে প্রায় কেঁদে ফেলে বললেন, "সত্যি? সত্যি?"

ফরাসত আলি একটু অবাক হয়ে বললেন, "সত্যি।

রইসউদ্দিন তখন তাঁর পকেট থেকে পাঁচশো টাকা বের করে ফরাসত আলির হাতে দিয়ে বললেন, "এই যে, একটা টিকেট পাঁচ টাকা করে একশোটা টিকেটের জন্যে পাঁচশো টাকা।"

ফরাসত আলি টাকাটা খানিকক্ষণ হাতে রেখে আবার কী মনে করে রইসউদ্দিনকে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, "এখন দিতে হবে না, বিকালে দিও?"

রইসউদ্দিন খানিকক্ষণ ঝোলাঝুলি করে শেষ পর্যন্ত বিদায় নিলেন। ফরাসত আলি দরজা বন্ধ করে ফিরে আসছিলেন তখন আবার দরজায় শব্দ হল, দরজা খুলে দেখেন তাঁর কাস্টমসের বন্ধু এমাজউদ্দিন। এমাজউদ্দিনের হাতে একটা বিশাল রুইমাছ। ফরাসত আলি অবাক হয়ে বললেন, "আরে এমাজউদ্দিন, তুমি এত বড় রুইমাছ নিয়ে কোথায় যাও?"

"তোমার কাছে এসেছি। ভাবলাম অনেকদিন দেখা নেই, একটু দেখা করে আসি।"

"কে বললে দেখা নেই? এই তো সেদিন দেখা হল!"

"তা বটে!" এমাজউদ্দিন একটু বোকার মতো হেসে হাতের মাছটা দেখিয়ে বললেন, "সস্তায় পেয়ে গেলাম মাছটা, তোমার জন্যে নিয়ে এলাম।"

ফরাসত আলি বললেন, "কী আশ্চর্য! আজকে সবাই দেখি আমার জন্যে কিছু-না-কিছু নিয়ে আসছে!"

এমাজউদ্দিন ইলেকট্রিক শক খাওয়ার মতো চমকে উঠে বললেন, "আর কে এসেছে?"

"প্রফেসর রইসউদ্দিন।"

এমাজউদ্দিন ছোট ছোট চোখ করে জিজ্ঞেস করলো, "কেন এসেছিল?"

"লটারির টিকেট কিনতে।"

"তু-তু-তুমি দিয়ে দিয়েছ?"

"এখনও দিইনি।"

এমাজউদ্দিন একবারে হাতজোড় করে বললেন, "রইসকে দিও না, প্লীজ আমাকে দাও। আমি সবগুলি কিনে নেব ডবল দাম দিয়ে। এই দ্যাখো নগদ দিয়ে দিচ্ছি—"

এমাজউদ্দিন পকেট থেকে টাকা বের করছিলেন ফরাসত আলি তাঁকে থামালেন, বললেন, "এখন দেয়ার দরকার নেই, বিকেলবেলা দিও। আমি আগে টিকেটগুলি খুঁজে বের করে রাখি।"

এমাজউদ্দিন ফরাসত আলির দুই হাত ধরে প্রায় কেঁদে ফেলে বললেন, "দেবে তো আমাকে টিকিটগুলি? দেবে তো?"

ফরাসত আলি চিন্তিত মুখে বললেন, "দেখি।"

এমাজউদ্দিন চলে যাবার পর দরজা বন্ধ করার আগেই ফরাসত আলি দেখতে পেলেন ডাক্তার আবু তালেব আর অ্যাডভোকেট আব্দুল করিম হন্তদন্ত হয়ে আসছেন। আবু

তালেবের পিছনে একটা ছোট ছেলে, তার মাথায় একঝাঁকা কমলা। আব্দুল করিমের হাতে একটা প্যাকেট, প্যাকেটের ভিতরে কি বোঝা যাচ্ছে না তবে দোকানের নাম দেখে বোঝা যাচ্ছে ভিতরে নিশ্চয়ই নতুন শার্ট। দুজনের মুখেই একধরনের বিগলিত হাসি এবং তারা কিছু বলার আগেই ফরাসত আলি টের পেয়ে গেলেন তাঁরা কী বলবেন।

হঠাৎ করে তার একটা বিচিত্র সন্দেহ হতে শুরু করল।

ফারুখ বখত সবসময় খবরের কাগজ খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েন, কিছুই ছেড়ে দেন না। হারানো বিজ্ঞপ্তি থেকে শুরু করে স্বপ্নপ্রদত্ত ঔষধ, মশাল মিছিল থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রীর কাছে খোলা চিঠি সবকিছু তিনি খুব শখ করে পড়েন। তিনি কিছুই বাদ দেন না বলে লটারির টিকেট পর্যন্ত যেতে তাঁর একটু দেরি হল কিন্তু যেই তিনি বিজয়ী টিকেটের নাম্বারটি পড়লেন তাঁর চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। নাম্বারটি দ্বিতীয়বার পড়ে তিনি চিৎকার করে লাফিয়ে উঠলেন, তারপর খবরের কাগজটা হাতে নিয়ে সেই অবস্থায় ফরাসত আলির বাসার দিকে ছুটতে শুরু করলেন। বড় রাস্তার মোড়ে এসে তাঁর একটা স্যান্ডেল ছিঁড়ে গেল, তিনি সেটা ফেলে এক পায়ে স্যান্ডেল পরে ছুটতে লাগলেন। খানিকক্ষণ পর অন্য স্যান্ডেলের ফিতা খুলে গেল, তিনি তখন সেটা ছুড়ে ফেলে খালিপায়ে ছুটতে লাগলেন। স্কুলের কাছে এলে তাঁর সার্ট একটা দোকানের ঝাঁপিতে লেগে পটপট করে সবগুলি বোতাম ছিঁড়ে গেল, তিনি ভ্রূক্ষেপ করলেন না। বাজারের কাছে আসতেই মেয়ো কুকুরগুলি ঘেউঘেউ করে তাঁকে খানিকক্ষণ তাড়া করল, তিনি সেটা টেরও পেলেন না। দৌড়ে ফারুখ বখত যখন ফরাসত আলির বাসার কাছে পৌঁছালেন তখন তাঁর লুঙ্গি খুলে এল। তিনি দুই হাতে লুঙ্গি শক্ত করে ধরে ছুটতে ছুটতে কোনোরকমে তার বাসায় পৌঁছলেন। ফরাসত আলির দরজা খোলা ছিল, তিনি ভিতরে ঢুকে দড়াম করে মেঝেতে আছাড় খেয়ে পড়লেন।

ফরাসত আলি শব্দ শুনে ছুটে এসে ফারুখ বখতকে এভাবে দেখে একেবারে আঁতকে উঠলেন। একটা হাতপাখা এনে বাতাস করতে করতে জিজ্ঞেস করলেন, "ফারুখ কী হয়েছে? কী হয়েছে তোর?"

ফারুখ বখত বড় বড় নিশ্বাস নিতে নিতে বললেন, "ল-ল-ল —"

"ল-ল-ল—কী?"

ফারুখ বখত আরও খানিকক্ষণ নিশ্বাস নিয়ে কোনোমতে বললেন, "টা-টা-টা—"

ফরাসত আলি কিছু বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে তাঁর ছেলেবেলার বন্ধুর দিকে তাকিয়ে রইলেন। ফারুখ বখত সবসময়েই একটু পাগলাটে ছিলেন, ফরাসত আলির সন্দেহ হতে লাগল হয়তো এখন পুরোপুরি পাগল হয়ে গেছেন।

মিনিট পাঁচেক পর ফারুখ বখত ধাতস্থ হয়ে বললেন, "লটারি-লটারি?"

"লটারি?"

"হ্যাঁ। তোর লটারির টিকেট—"

"কি হয়েছে আমার লটারির টিকেট?"

"তোর টিকেট তিরিশ লক্ষ টাকা জিতেছে।"

শুনে ফরাসত আলি মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছিলেন, কোনোমতে ফারুখ বখতকে ধরে সামলে নিলেন। বড় বড় কয়েকটা নিশ্বাস নিয়ে বললেন, "কী বললি? কী বললি?"

"তুই তিরিশ লক্ষ টাকা জিতেছিস লটারিতে!"

"সত্যি?"

"সত্যি। এই দ্যাখ খবরের কাগজে উঠেছে! চ ১১১১১১১১১।"

ফরাসত আলি খবরের কাগজটা দেখে মাটিতে বসে পড়লেন। তাঁর হাত অল্প অল্প কাঁপতে লাগল, তাঁকে দেখে মনে হতে লাগল তার শরীর খারাপ হয়ে গেছে, এখনই বুঝি হড়হড় করে বমি করে দেবেন। দেখে ফারুখ বখত একটু ঘাবড়ে গেলেন, ফরাসত আলিকে আস্তে একটু ধাক্কা দিয়ে বললেন, "কী হল তোর?"

ফরাসত আলি ফ্যালফ্যাল করে ফারুখ বখতের দিকে তাকিয়ে রইলেন। ফারুখ বখত তাঁর ঘাড়ে একটা থাবা দিয়ে বললেন, "একটু আনন্দ কর! তুই এখন তিরিশ লক্ষ টাকার মালিক।"

"তি-তি-তিরিশ লক্ষ? এত টাকা দিয়ে আমি কী করব?"

"ধুর গাধা! টাকা দিয়ে মানুষ আবার কী করে! তুই খরচ করবি।"

"তিরিশ লক্ষ টাকা আমি খরচ করব? আমি একা?" ফরাসত আলি একেবারে কাঁদোকাঁদো হয়ে গেলেন, ফারুখ বখতের দিকে তাকিয়ে ভাঙা গলায় বললেন, "তুই অর্ধেক নিবি?"

"আ-আ-আমি?"

"হ্যাঁ।"

"আমি কেন?"

"তুই আমার বন্ধু সেজন্যে! তা ছাড়া তুই বলেছিলি তুই অর্ধেক লটারির টিকেট কিনবি, মনে নেই? তোর ন্যায্য পাওনা! নিবি তুই, অর্ধেক টাকা?"

ফারুখ বখত বুঝলেন বেশি উত্তেজনায় তাঁর বন্ধুর মাথার ঠিক নেই। তিনি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "ঠিক আছে তুই যদি দিতে চাস দিবি।"

ফরাসত আলি তখন মনে হয় বুকে একটু জোর পেলেন। ফারুখ বখতের হাত ধরে বললেন, "তুই কথা দে।"

"এখানে আবার কথা দেওয়া না-দেওয়ার কী আছে? তিরিশ লক্ষ টাকা দিয়ে কত কী করা যায়, তুই এত ঘাবড়াচ্ছিস কেন? তুই কিছু চিন্তা করিস না, আমি সব ব্যবস্থা করে দেব। দরকার পড়লে আমি তোর সব টাকা খরচ করিয়ে দেব।"

"সত্যি দিবি? বুক ছুঁয়ে বল।"

"সত্যি দেব। এই দ্যাখ বুক ছুঁয়ে বলছি।"

ফরাসত আলি তখন প্রথমবার একটু হেসে উঠে দাঁড়ালেন। ফারুখ বখতও তখন উঠে দাঁড়াতে গিয়ে উরু চেপে ধরে বসে পড়লেন, দৌড়াদৌড়ি করে অভ্যাস নেই বহুদিন, হঠাৎ এতটুকু পথ দৌড়ে এসে তাঁর পায়ের মাংসপেশিতে কোথায় জানি টান পড়েছে। একপায়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে একটা চেয়ারে বসে তিনি ঘরের চারিদিকে তাকালেন। চারপাশে মিষ্টির বাক্স, রুইমাছ, কমলার ঝাঁকা আর উপহারের বাক্স। ফারুখ বখত জিজ্ঞেস করলেন, "এগুলি কী?"

"উপহার।"

"কার জন্যে উপহার?"

"আমার জন্যে। ফরাসত আলি মিটিমিটি হাসতে হাসতে বললেন, "আগে বুঝতে পারিনি কেন, এখন বুঝেছি। সবাই উপহার নিয়ে এসেছে আমার লটারির টিকেট কিনতে।"

ফারুখ বখত ভয়ে ভয়ে বললেন, "বিক্রি করে দিসনি তো?"

"না, দিইনি! একটা বইয়ের মাঝে রেখেছিলাম, বইটা তখন খুঁজে পাইনি, কপাল ভালো!"

"এখন পেয়েছিস?"

"হ্যাঁ। এই দ্যাখ।"

দুজন মিলে তাঁরা তখন ছোট লটারির টিকেটটার দিকে তাকিয়ে রইলেন, এইটুকু একটা কাগজ, কিন্তু সেটার দাম এখন তিরিশ লক্ষ টাকা বিশ্বাস হতে চায় না।

ফরাসত আলি খানিকক্ষণ পর একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, "বিকালবেলা সবাই আসবে টিকেট কিনতে। এখন কী করি?"

ফারুক বখত দাঁত বের করে হেসে বললেন, "দাঁড়া, ব্যাটাদের দেখাই মজা! কত বড় জোচ্চোর—তোর কাছ থেকে ঠকিয়ে লটারির টিকেটটা কিনে নিতে চাইছিল!"

"কী করবি?"

"আগে চল টিকেটটা সেফ ডেপোজিট বক্সে জমা দিয়ে আসি। আর দরজায় একটা চিঠি লিখে রেখে যা যে তুই লটারির টিকেটগুলি একটা খামে ভরে টেবিলের উপর রেখে যাচ্ছিস সবাই মিলে যেন ভাগাভাগি করে নেয়।"

সেদিন বিকালবেলা একটা আম্বুলেন্স প্রফেসর রইসউদ্দিন, কাস্টমসের এমাজউদ্দিন, ডাক্তর তালেব আলি তাঁর অ্যাডভোকেট আবদুল করিমকে ফরাসত আলি বাসা থেকে হাসপাতালে নিয়ে গেল। তাঁরা একজন আরেকজনের সাথে মারপিট করে রক্তারক্তি অবস্থা করেছেন। যারা ব্যাপারটা দেখেছে তারা বলেছে নিজের চোখে না দেখলে এই দুর্ধর্ষ মারপিট নাকি বিশ্বাস করা শক্ত। একটা খাম নিয়ে একজন নাকি আরেকজনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছিলেন, কিল-ঘুষি-চড়-লাথি মেরে খামচি দিয়ে চুল টেনে এক বিতিকিচ্ছিরি অবস্থা। পাড়ার ছেলেরা এসে অনেক কষ্টে তাঁদের আলাদা করে হাসপাতালে অ্যাম্বুলেন্সের জন্য ফোন করেছে।

২

তিরিশ লক্ষ টাকার উত্তেজনা কমতে অন্তত তিরিশ দিন লাগার কথা ছিল, কিন্তু ফরাসত আলি আর ফারুখ বখত সপ্তাহখানেকের মাঝে নিজেদের সামলে নিলেন। পরের শনিবারের মাঝে তাঁদের ভাবভঙ্গি দেখে মনে হতে লাগল লটারি জেতা বুঝি নিত্তনৈমিত্তিক ব্যাপার। পরিচিত মানুষজন অবিশ্যি ব্যাপারটা এত সহজে নিতে পারল না, বেশির ভাগই হিংসায় জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে গেল। আবার অনেকে যারা আগে কোনোদিন ফরাসত আলি আর ফারুখ বখতকে মানুষ হিসেবে গণ্য করেনি হঠাৎ করে তারা ফরাভাই এবং ফারুভাই বলতে অজ্ঞান হয়ে যেতে শুরু করল। ফরাসত আলি এবং ফারুখ বখত একদিন তাঁদের এই পরিচিত মানুষজনকে লুকিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে বসলেন টাকটা কীভাবে খরচ করা যায় সেটা ভেবেচিন্তে বের করতে। তাঁদের সামনে দুই কাপ চা, একটা সোলার পাওয়ার ক্যালকুলেটর, এক রিম কাগজ আর দুইটা বলপয়েন্ট কলম। ফরাসত আলি গোলাপি রঙের একটা চিরুনি দিয়ে তাঁর দাড়ি পাট করতে করতে চিন্তা করতে লাগলেন,

যে-দাড়ি কামানোর জন্যে রেজর কিনতে গিয়ে তিনি এতগুলি টাকা পেয়ে গেছেন হঠাৎ করে তাঁর সেই দাড়ির জন্যে একটু মায়া পড়ে গেছে, দিনরাত সেটা কুটকুট করলেও তিনি আর সেটা কেটে ফেলছেন না। খানিকক্ষণ ছাদের দিকে তাকিয়ে চিন্তা করতে করতে হঠাৎ করে বললেন, "আমার বড় রেলগাড়ির শখ। একটা রেলগাড়ি কিনলে কেমন হয়?"

ফারুখ বখত চায়ে চুমুক দিতে গিয়ে বিষম খেয়ে বললেন, "রেলগাড়ি?"

"হ্যাঁ, মনে কর পার্সোনাল একটা রেললাইন বসানো হল, তার মাঝে একটা ট্রেন। বেশি বড় দরকার নেই, ছোটখাটো একটা ট্রেন। যাবে আর আসবে।"

ফারুখ বখত ক্যালকুলেটরে খানিকক্ষণ হিসাব করে বললেন, "তোর যদি সত্যি ট্রেন ভালো লাগে তা হলে তিরিশ লাখ টাকার ট্রেনের টিকেট কিনে টানা কুড়ি বছর ট্রেনে চড়তে পারবি। খামোকা ট্রেন কিনে কী করবি? আর ট্রেন কি কোরবানির খাসি নাকি যে গাবতলি বাজার থেকে কিনে আনবি?"

ধমক খেয়ে ফরাসত আলি একটু দুর্বল হয়ে মিনমিন করে বললেন, "তা হলে একটা হেলিকপ্টার? হেলিকপ্টারের আমার অনেকদিনের শখ, কী সুন্দর আকাশে ওড়ে!"

ফারুখ বখত ভুরু কুঁচকে বললেন, "হেলিকপ্টার?"

ফরাসত আলি মাথা নেড়ে বললেন, "হ্যাঁ, তা হলে সেটা মানুষের কাজেও ব্যবহার করা যাবে। মনে কর কোনো গ্রামে কারও অসুখ হল, তাকে হাসপাতালে নিতে হবে, সাথে সাথে হেলিকপ্টার পাঠিয়ে—"

"সেটাই যদি করতে চাস, তা হলে সোজাসুজি একটা হাসপাতাল তৈরি করতে দোষ কি?"

"হাসপাতাল?" ফরাসত আলি কেমন যেন একটু ভয় পেয়ে গেলেন, আমতা আমতা করে বললেন, "হাসপাতাল আমার কেমন জানি ভয় ভয় করে। ওষুধ আর ফিনাইলের কী বোটকা গন্ধ! চারিদিকে রাগী-রাগী চেহারার ডাক্তার, তার মাঝে এখানে-সেখানে পা-ভাঙা মাথা-ভাঙা মানুষ চিৎকার করছে!" ফরাসত আলি একটু শিউরে উঠে বললেন, "হাসপাতাল থেকে শিশুপার্ক ভালো! ছোট বাচ্চারা খেলবে, দেখতেও ভালো লাগবে।"

ফারুখ বখত মাথা নাড়লেন, "আইডিয়াটা খারাপ না, তিরিশ লাখ টাকা দিয়ে মনে হয় ভালো একটা শিশুপার্ক তৈরি করা যাবে। একটা-দুইটা রোলার কোস্টার, বড় দেখে একটা নাগর দোলা, কয়েকটা মেরি-গো-রাউন্ড—"

ফরাসত আলি দাড়ি চুলকাতে চুলকাতে বললেন, "কিন্তু বাচ্চাদের বাবা-মায়েরা ধরে আমাদের মার লাগাবে না তো? এমনিতেই ছেলেপিলেরা পড়াশোনা করে না, এখন তার উপর যদি তাদের খেলাধুলার জন্যে লাখ লাখ টাকা খরচ করে ফেলি— আর কি কখনো বই নিয়ে বসবে?"

ফারুখ বখত হঠাৎ সোজা হয়ে বসলেন। চোখ বড় বড় করে বললেন, "ঠিক বলেছিস!"

"কী ঠিক বলেছি?"

"পড়াশোনা।"

"কী পড়াশোনা?"

"বাচ্চাদের পড়াশোনা। শিশুপার্ক তৈরি না করে তৈরি করতে হবে স্কুল।"

"স্কুল?"

"হ্যাঁ, আজেবাজে স্কুল না, একেবারে একনম্বর স্কুল। খেলতে খেলতে বাচ্চারা পড়বে—কিছু বোঝার আগে একেকজন শিখে যাবে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ক্যালকুলাস—" ফারুখ বখত উৎসাহে হাতে একটা কিল দিলেন।

ফরাসত আলি ভয়ে ভয়ে বললেন, "বাচ্চাদের পড়াবে কে?"

"তুই পড়াবি আমি পড়াব। বেছেবেছে সারাদেশ খুঁজে মাস্টার নিয়ে আসব আমরা। বইপত্র দেখে একেবারে আধুনিক পদ্ধতিতে পড়াশোনা। হাসতে হাসতে পড়াশোনা। খেলতে খেলতে পড়াশোনা!" ফারুখ বখত উৎসাহে দাঁড়িয়ে পড়ে হাঁটতে শুরু করেন।

ফরাসত আলি মাথা চুলকে বললেন, "বাচ্চাদের বাবা-মায়েরা আমাদের স্কুলে দেবে তাদের বাচ্চাদের?"

"কেন দেবে না? একশোবার দেবে! কোথায় পাবে এরকম স্কুল? ক্লাস ওয়ানে আমরা শেখাব ক্যালকুলাস। ক্লাস টুতে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি। ক্লাস থ্রি থেকে কম্পিউটার প্রোগ্রামিং। ক্লাস ফোরে ইলেকট্রনিক্স, বিপ্লব শুরু করে দেব আমরা। সবার চোখ খুলে যাবে একেবারে। আমাদের দেখাদেখি সবাই শুরু করবে— দেশের চেহারা পালটে যাবে দেখতে দেখতে—"

ফরাসত আলি কোন কথা না বলে তার দাড়ি এবং চুল চুলকাতে লাগলেন। ফারুখ বখত বললেন, "তুই কোন কথা বলছিস না কেন? পছন্দ হয় নি আইডিয়াটা?"

ফরাসত আলী তাড়াতাড়ি মাথা নাড়লেন, "হয়েছে হয়েছে। পছন্দ হয়েছে।"

"পছন্দ না হলে এখনই বল। এটা তো আর কাপড়ের দোকান তৈরি করছি না, তৈরি করছি স্কুল, যেখানে বাচ্চাদের মন নিয়ে কাজ করা হবে। হেলাখেলা করার কোনো ব্যাপারই না।"

ফরাসত আলী মাথা নেড়ে বললেন, "আমি হেলাখেলা করছি না, মোটেও হেলাখেলা করছি না।"

"তেরি গুড! স্কুলের জন্যে জমি কিনতে হবে, বিল্ডিং তুলতে হবে, মাস্টারদের জন্যে বিজ্ঞাপন দিতে হবে, তাদের ট্রেনিং দিতে হবে, বাচ্চাদের ভরতি করতে হবে—অনেক কাজ।"

ফরাসত আলি মাথা নেড়ে বললেন, "অনেক কাজ।"

যখন কাউকে অল্পকিছু কাজ করতে হয় সেটি শুরু করতে বেশি অসুবিধে হয় না, কিন্তু যখন অনেক কাজ করা বাকি থাকে তখন কোনখান থেকে শুরু করা হবে সেটা ঠিক করতেই সবার মাথা-খারাপ হয়ে যায়। ফরাসত আলি ও ফারুখ বখতের বেলাতেও তা-ই হল, তাঁরা প্রত্যেকদিন সকালে দুপুরে এবং বিকালে এক রিম কাগজ আর দুইটা বলপয়েন্ট কলম নিয়ে বসতে লাগলেন আর কাগজে লম্বা লম্বা লিস্ট করতে লাগলেন, কিন্তু এর বেশি আর কাজ এগুল না। ব্যাপারটা হয়তো এভাবেই চলতে থাকত কিন্তু তার মাঝে একটা ছোট ঘটনা ঘটে গেল।

ফরাসত আলি ভোরবেলা ঘুম থেকে দেরি করে উঠে তাঁর চায়ের কাপে চুমুক দিয়েছেন ঠিক তখন দরজায় শব্দ হল। লটারিতে তিরিশ লক্ষ টাকা জিতে যাওয়ার পর নানাধরনের মানুষ তাঁকে দিনরাত উৎপাত করে তাই তিনি একটু খোঁজখবর না নিয়ে দরজা খোলেন না। ফরাসত আলি দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিলেন, মাথায় এলোমেলো চুল, চোখে ভারী চশমা একজন মানুষ হাতে একটা কাপড়ের ঝোলা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

এরকম চেহারার মানুষেরা সাধারণত সাহায্যের জন্যে আসে— ফরাসত আলি একবার ভাবলেন দরজা খুলবেন না, কিন্তু চোখের ভারী চশমাটা দেখে তাঁর কী মনে হল তিনি দরজা খুলে জিজ্ঞেস করলেন, "কাকে চান?"

লোকটি মাথা চুলকে বলল, "সেটা তো ঠিক জানি না।"

"তাহলে দরজায় ধাক্কা দিলেন যে—"

"ইয়ে মানে যাকে খুঁজছি সেই মানুষটার নাম—"

"কী নাম?"

ভারী চশমা চোখের মানুষটা আবার খানিকক্ষণ মাথা চুলকে বলল, "মনে হয় নাম ওরাফত।"

"ওরাফত? ওরাফত আবার কোন দেশী নাম?"

"জানি না কোন দেশী। তবে মানুষটা মনে হয় মেয়েমানুষ।"

"মেয়েমানুষ?" ফরাসত আলি তখন মাথা নেড়ে বললেন, "না ভাই, এই বাসায় কোনো মেয়েমানুষ থাকে না।"

ভারী চশমা চোখের মানুষটার তখন খুব আশাভঙ্গ হল বলে মনে হল, খানিকক্ষণ দরজায় দাঁড়িয়ে থেকে বলল, "আপনি হয়তো বলতে পারবেন কোথায় থাকে সেই মহিলা।"

ফরাসত আলি মাথা চুলকে বললেন, "আমি আসলে খুব বেশি মহিলাকে চিনি না।"

"এই মহিলাকে হয়তো চিনবেন। মনে হয় খুব দজ্জাল মহিলা।"

"দজ্জাল মহিলা?"

"হ্যাঁ। কারণ—" ভারী চশমা চোখের মানুষটি মাথা চুলকে বলল, "সবাই দেখি মহিলাটিকে একটা গালি না দিয়ে কথা বলে না।"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ। মহিলার নাম ওরাফত, সবাই ডাকে ওরাফত শালী।"

ফরাসত আলি খুব অবাক হলেন, একজন মহিলা সে যত দজ্জালই হোক তাকে লোকজন শালী বলে ডাকবে তিনি বিশ্বাস করতে পারলেন না। জিজ্ঞেস করলেন, "মহিলা দেখতে কেমন?"

মানুষটি আবার তার মাথা চুলকে বলল, "সেটাও খুব অবাক ব্যাপার। তার মুখে নাকি দাড়ি-গোঁফ।"

"মহিলার মুখে দাড়ি-গোঁফ?"

"হ্যাঁ। লটারিতে কয়েকদিন আগে তিরিশ লক্ষ টাকা পেয়েছে।"

ফরাসত আলি চমকে উঠলেন, "লটারিতে তিরিশ লক্ষ টাকা পেয়েছে, মুখে দাড়ি-গোঁফ, নাম ওরাফত শালী?"

"হ্যাঁ।"

ফরাসত আলি হঠাৎ করে খুব গম্ভীর হয়ে বললেন, "বুঝেছি।"

"কি বুঝেছেন?"

"নাম বলেছেন ওরাফত শালী— আসলে সেটা ফরাসত আলি। ফরাসত আলি মোটেও দজ্জাল মহিলা না, পুরুষমানুষ।"

"চেনেন আপনি?"

"চিনি। আমিই ফরাসত আলি।"

শুনে ভারী চশমা চোখের মানুষটি দাঁত বের করে আনন্দে হেসে ফেলল, হাত বের করে তার সাথে কয়েকবার জোরে জোরে হাত মিলিয়ে বলল, "আমার নাম হারুন ইঞ্জিনিয়ার। আমি আপনাকে কয়েকদিন থেকে খুঁজছি।"

"কেন?"

"আপনি যে স্কুল তৈরি করবেন তার বিল্ডিং তৈরি করার জন্য।"

ফরাসত আলি অবাক হয়ে হারুন ইঞ্জিনিয়ারের দিকে তাকালেন, "আপনি কেমন করে জানেন আমি স্কুল তৈরি করব? কাউকে তো বলিনি আমরা!"

হারুন ইঞ্জিনিয়ার আবার দাঁত বের করে হাসলেন। "কাউকে বলতে হয় নাকি, সবাই তো জানে।"

"সবাই জানে?"

"না জানার কী আছে? বড়লোকেরা লটারি জিতলে টাকাগুলি যক্ষের মতো আগলে রাখে। আর আমার আপনার মতো মানুষেরা লটারি জিতলে টাকাটা ভালো কাজে খরচ করে। স্কুল কলেজ হাসপাতাল দেয়। গরিব আত্মীয়স্বজনের ছেলেপুলের পড়ার খরচ দেয়। দেয় না?"

ফরাসত আলি একটু হতচকিত হয়ে মাথা নাড়লেন। হারুন ইঞ্জিনিয়ার তাঁর ভারী চশমাটা খুলে ভালো করে মুছে বললেন, "আপনি কী দেবেন? স্কুল কলেজ না হাসপাতাল?"

"স্কুল।"

"স্কুলটাই ভালো। দেশের কাজ হয়। বাচ্চাদের না বড়দের?"

"বাচ্চাদের।"

"সেটা আরও ভালো। হারুন ইঞ্জিনিয়ার এবারে ঘরের ভিতরে ঢুকে নিজেই একটা চেয়ারে আরাম করে বসে বললেন, "এবারে আমি বলি আমি কী জন্যে এসেছি।"

ফরাসত আলি কাছাকাছি আরেকটা চেয়ারে বসে নিজের চায়ের কাপটা টেনে নিয়ে বললেন, "বলেন।"

"বাড়িঘর কিভাবে তৈরি হয় তা আপনি জানেন?"

ফরাসত আলি দাড়ি চুলকাতে চুলকাতে বললেন, "ঠিক জানি না।"

"প্রথমে ফাউন্ডেশান তৈরি করতে হয়, তারপর পিলার লোহার রড দিয়ে শক্ত করতে হয়, কংক্রিট ঢেলে দিতে হয়। তারপর ছাদ ঢালাই, দেয়াল, তারপর দরজা-জানালা!"

ফরাসত আলি মাথা নাড়লেন।

"মনে করেন আপনি এভাবে একটা বাসা তৈরি করলেন। বাসা তৈরি শেষ হল, কয়েক বছর থাকলেন তখন আপনার মনে হল, নাহ্ এই ঘরটা এখানে না হয়ে ওখানে হলে ভালো হত। তখন আপনি কী করবেন?"

ফরাসত আলি কী করবেন বুঝতে না পেরে আবার দাড়ি চুলকালেন। হারুন ইঞ্জিনিয়ার খানিকক্ষণ তাঁর দাড়ি চুলকানো দেখে একগাল হেসে বললেন, "হ্যাঁ, আপনি দাড়ি চুলকাবেন। আর দাড়ি যদি না থাকে তা হলে আঙুল চুষবেন। কারণ একবার বাসা তৈরি হয়ে গেলে আর কিছুই করার নেই। কিন্তু আমি—হারুন ইঞ্জিনিয়ার নতুন একটা প্রসেস দাঁড় করিয়েছি, আমেরিকা জার্মানি আর জাপানে এর পেটেন্ট রয়েছে, এইভাবে বাসা তৈরি করা হলে, যখন খুশি খুলে সেটা নূতন করে লাগানো যায়। দরকার হলে নূতন জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায়। শীতের সময় সূর্যের আলো ঢুকতে দিলেন, গরমের সময় বাসা

ঘুরিয়ে সূর্যের দিকে পিছনে করে দিলেন। একতলা বাসা তৈরি করলেন, হঠাৎ খেলার জন্যে ব্যাডমিন্টন কোর্ট দরকার একটা ঘরের উপর আরেকটা ঘর তৈরি করে বাসাটাকে দোতলা করে বাসার সামনে খোলা মাঠ বের করে দিলেন।"

ফরাসত আলি চোখ বড় বড় করে হারুন ইঞ্জিনিয়ারের কথা শুনছিলেন, জিজ্ঞেস করলেন, "কী দিয়ে তৈরি করেন এই বাসা?"

হারুন ইঞ্জিনিয়ার টেবিলে একটা ছোট থাবা দিয়ে বললেন, "সেটাই হচ্ছে সিক্রেট, কিন্তু আপনাকে আমি বলব। আপনার কাছে কোনো সিক্রেট নাই। বাসা তৈরি হয় প্লাস্টিক দিয়ে।"

"প্লা-প্লা-প্লাস্টিকের বাসা?"

"হ্যাঁ। কিন্তু মনে করবেন না যেই প্লাস্টিক দিয়ে চিরুনি তৈরি হয় সেই প্লাস্টিক। এই দেখেন একটা স্যাম্পল!"

হারুন ইঞ্জিনিয়ার তাঁর কাপড়ের ঝোলার মাঝে হাত দিয়ে কালোমতন একটা টুকরো বের করে নিয়ে এসে ফরাসত আলির হাতে দিলেন। ফরাসত আলি সেটা নেড়েচেড়ে দেখলেন। জিনিসটা পাতলা কাঠের মতো হালকা কিন্তু পাথরের মতো শক্ত। চকচকে একটা ভাব রয়েছে দেখে মনে হয় লোহা বা অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি।

হারুন ইঞ্জিনিয়ার জিনিসটা হাতে নিয়ে বক্তৃতা দেয়ার মতো করে বললেন, "এর হিট কনডাক্টিভিটি সিরামিকের, স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি কাগজের কিন্তু টেনসিল স্ট্রেংথ ইস্পাতের।"

ফরাসত আলি কিছু না বুঝে মাথা নাড়লেন। হারুন ইঞ্জিনিয়ার গলার স্বর আরো উঁচু করে বললেন, "এটা করাত দিয়ে কাটা যায়, ড্রিল দিয়ে ফুটো করা যায়, কিন্তু পানি দূরে থাকুক অ্যাসিড দিয়েও গলানো যায় না। বৃষ্টিতে ভিজবে না, আগুনে পুড়বে না।"

ফরাসত আলি চমৎকৃত হয়ে তাকিয়ে ছিলেন, জিজ্ঞেস করলেন, "জিনিসটা আপনি তৈরি করেছেন?"

"অবশ্যি! আমার দশ বছরের সাধনা! দশ বছর আগে আমি একদিন মগবাজার থেকে হেঁটে আসছি, দেখি রাস্তার কাছে স্তূপ হয়ে আছে আবর্জনা, দুর্গন্ধে নাড়ি উলটে আসে! আমি ভাবলাম এই যদি আবর্জনার নমুনা হয় একদিন এই দেশ আবর্জনায় তলিয়ে যাবে। দেশের জন্যে যদি কিছু করতে হয় এই আবর্জনার একটা গতি করতে হবে। সেই থেকে আমি আবর্জনা নিয়ে গবেষণা করছি।"

"আবর্জনা নিয়ে?"

"হ্যাঁ। লোকজন আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করেছে। আবর্জনা নিয়ে কাজ করতাম বলে আমার শরীর থেকে সব-সময় দুর্গন্ধ বের হত। একদিন আমার বউ আমাকে ছেড়ে চলে গেল। রেস্টুরেন্টে গেলে লোকজন উঠে যেত, বাসে উঠলে বাসের লোকজন নেমে যেত, কিন্তু আমি ছেড়ে দিইনি। দশ বছরের গবেষণার ফল এই প্লাস্টিজনা!"

"প্লাস্টিজনা?"

"হ্যাঁ, প্লাস্টিক এবং আবর্জনা। প্লাস্টিজনা। নামটা ভালো হয় নি?"

ফরাসত আলি মাথা নাড়লেন, "ভালো হয়েছে।".

"সারা পৃথিবীতে আবর্জনা নিয়ে সমস্যা, আর আবর্জনার বেশির ভাগ হচ্ছে প্লাস্টিক। এক ঢিলে মানুষ দুই পাখি মারে, আমি তিন পাখি মেরেছি, আবর্জনার গুষ্টি উদ্ধার করে ছেড়েছি প্লাস্টিকটা ব্যবহার করেছি আর সেটা দিয়ে তৈরি করেছি প্লাস্টিজনা! ঠিক কি না?"

ফরাসত আলি মাথা নাড়লেন, "ঠিক।"

"এবার তা হলে কাজের কথায় আসি।"

"কাজের কথা? ফরাসত আলি মনে-মনে ভাবলেন, এতক্ষণ তা হলে কি অকাজের কথা হচ্ছিল?

"হ্যাঁ, আমি এখন বলি আমি কেন এসেছি। আমি আমার প্লাস্টিজনা দিয়ে আপনার পুরো স্কুল তৈরি করে দেব। শুধু স্কুল না— স্কুলের দরজা জানালা চেয়ার টেবিল বেঞ্চ ব্ল্যাকবোর্ড সবকিছু। ছয় মাসের ভিতরে।"

"ছয় মাসের ভিতরে?"

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু আমাদের স্কুলের জমি এখনো কেনা হয় নি!

হারুন ইঞ্জিনিয়ার একগাল হেসে বললেন, "আমার স্কুল তৈরি করতে জমি লাগে না। আপনি ধীরেসুস্থে জমি কেনেন।"

ফরাসত আলি দাড়ি চুলকে বললেন, "খরচ পড়বে কত?"

"খরচের কথা ভাববেন না। দরকার হলে আমি ফ্রী তৈরি করে দেব।"

"ফ্রী? ফ্রী কেন করে দেবেন?"

ভারী চশমার আড়ালে হারুন ইঞ্জিনিয়ারের চোখ হঠাৎ ভাবগম্ভীর হয়ে ওঠে, তিনি কাঁপা গলায় বললেন, "কারণ আমি পৃথিবীকে দেখাতে চাই আমার প্লাস্টিজনা দিয়ে পৃথিবীতে বিপ্লব করে দেয়া যায়!"

ফরাসত আলি জোরে জোরে মাথা নাড়লেন, বললেন, "অবশ্যি! অবশ্যি!"

হারুন ইঞ্জিনিয়ার বললেন, "পৃথিবীকে চমৎকৃত করার এই হচ্ছে সুযোগ। এখন বলেন আপনি রাজি কি না।"

ফরাসত আলি চুল এবং দাড়ি একসাথে চুলকে বললেন, "আমার তো মনে হচ্ছে আইডিয়াটা খুবই ভালো কিন্তু আমার বন্ধু ফারুখ বখতের সাথে কথা না বলে আমি তো কথা দিতে পারছি না!"

"কোনো চিন্তা নেই, আপনি তাঁর সাথে কথা বলেন।"

"আপনাকে আমি কোথায় পাব?"

"এইখানে।"

"এইখানে?"

"হ্যাঁ। হারুন ইঞ্জিনিয়ার অমায়িকভাবে হেসে বললেন, "নতুন জায়গা, কিছু চিনি না, কোথায় উঠে কোন ঝামেলায় পড়ব, তাই আপনার বাসাতেই উঠে গেলাম। আমার খাওয়া নিয়ে কিছু চিন্তা করবেন না, আমি সবকিছু খাই। শুনেছি এখানকার পাবদা মাছ নাকি জগদ্বিখ্যাত?"

ফরাসত আলি মাথা নাড়লেন, সত্যি সত্যি এখানকার পাবদা মাছ জগদ্বিখ্যাত।

ফারুখ বখত সবকিছু শুনে আরও অনেক বেশি উৎসাহিত হলেন। প্লাস্টিজনার টুকরাটি দেখে আবেগে তাঁর চোখে পানি এসে গেল। তিনি হারুন ইঞ্জিনিয়ারকে একেবারে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "ভাই হারু, তোমার মতো আর কয়েকজন মানুষ হলেই এই দেশের ইতিহাস অন্যভাবে লেখা হত।"

ফারুখ বখতের কথা শুনে হারুন ইঞ্জিনিয়ারের ভারী চশমার কাচও ঝাপসা হয়ে এল। তিনি সেটা খুলে শার্টের হাতায় মুছতে মুছতে বললেন, "ভাই ফারু এবং ভাই ফরা,

তোমরা দুইজন হলে প্রথম মানুষ যারা আমার এই আবিষ্কারের প্রকৃত মর্ম বুঝতে পারলে।"

ফরাসত আলি সাধারণত আবেগে কাতর হয়ে যান না, কিন্তু এই মুহূর্তে দুইজন মানুষকে এইভাবে কাঁদোকাঁদো হয়ে যেতে দেখে তিনিও একটু দুর্বল হয়ে গেলেন। ধরা গলায় বললেন, "ভাই হারু, তুমি কোনো চিন্তা কোরো না। দরকার হলে আমাদের তিরিশ লক্ষ টাকার শেষ পাই পয়সা খরচ করে এই প্লাস্টিজনাকে আমরা বাংলাদেশের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেব।"

কয়েকদিনের মাঝেই মহা উৎসাহে প্লাস্টিজনার কাজ শুরু হল। শহরের বাইরে অনেকটুকু জায়গা নেয়া হল, পৌরসভার ট্রাক সেখানে শহরের আবর্জনা ফেলতে লাগল। নাকে রুমাল বেঁধে হারুন ইঞ্জিনিয়ার সেগুলি ঘাঁটাঘাঁটি করতে লাগলেন। বড় বড় ড্রামের নিচে আগুন জ্বলতে লাগল। তিনি সেখানে নানারকম ওষুধপত্র ঢালতে লাগলেন। হারুন ইঞ্জিনিয়ার আরও কিছু লোক নিয়েছেন, তারাও নাকে রুমাল বেঁধে প্লাস্টিকের বালতি করে কালচে একধরনের তরল এক ড্রাম থেকে অন্য ড্রামে ঢালাঢালি করতে লাগল। মাটি দিয়ে একধরনের ছাঁচ তৈরি করা হয়েছে সেখানে মণ্ড ঢেলে দেয়া হল, সেগুলিকে চাপা দিয়ে চৌকোণা প্লাস্টিজনার টুকরো বের হতে লাগল। এক পাশে ছোট একটা ছাউনি করা হয়েছে—সেখানে কিছু যন্ত্রপাতি বসানো হয়েছে, প্লাস্টিজনার টুকরোগুলি সেখানে পরীক্ষা করা হয়, মেপে দেয়া হয়, কেটেকুটে ঠিক করা হয়। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কাজ চলছে, তিন ঘন্টা পরপর চা খাওয়ার অবসর। বিরাট বড় কেতলিতে চায়ের পানি গরম হচ্ছে, ছোট একটা ছেলে ছোট ছোট কাপে চা ঢেলে দিচ্ছে এবং হারুন ইঞ্জিনিয়ার তাঁর দলবল নিয়ে চা খাচ্ছেন— এই দৃশ্যটিতে সবাই অভ্যস্ত হয়ে গেল।

হারুন ইঞ্জিনিয়ার পরিশ্রমী মানুষ। সারাদিন খেটেখুটে কাজ করে রাতে বাসায় ফিরে এসেও বিশ্রাম নেন না। পাবদা মাছের ঝোল দিয়ে এক গামলা ভাত খেয়ে স্কুলঘর ডিজাইন করতে শুরু করেন। একটা মাঝারি কম্পিউটার কেনা হয়েছে—সেখানে তিনি স্কুলঘরের নকশা করতে থাকেন। চারিদিকে বড় বড় জানালা, ছাত্রদের জন্যে বেঞ্চ, মাস্টারদের জন্যে চেয়ার-টেবিল, দেয়ালে ব্ল্যাকবোর্ড। ছোট ক্লাসের জন্যে ক্লাসঘরের মাঝে নানারকম খেলাধুলার ব্যবস্থা।

হারুন ইঞ্জিনিয়ারের কাজ দেখে ফারুখ বখত আর ফরাসত আলিও উৎসাহ পেয়েছেন। তাঁরা ঘোরাঘুরি করে স্কুলের জন্যে জায়গা খুঁজতে লাগলেন। শহরের মাঝামাঝি ফাঁকা জায়গা পাওয়া এত সহজ নয়, শহরের বেশি বাইরেও তাঁরা যেতে চান না। জায়গা পছন্দ হবার পরেও নানারকম যন্ত্রণা। সেটি দলিল করতে হয়, তার দখল নিতে হয়। তবুও কাজকর্ম মোটামুটি এগিয়ে যেতে থাকল।

প্লাস্টিজনার টুকরো দিয়ে স্কুলঘর তৈরি শুরু হয়েছে। ছোট ছোট টুকরো একসাথে জুড়ে বড় দেয়াল তৈরি হচ্ছে, চার দেয়াল লাগিয়ে ঘর। উপরে ছাদ নিচে মেঝে। দিনরাত লোকজন কাজ করছে, ড্রিল দিয়ে ফুটো করা হচ্ছে, স্ক্রু দিয়ে লাগানো হচ্ছে, ইলেকট্রিক করাত দিয়ে কাটা হচ্ছে, হাতুড়ির শব্দ, জিনিসপত্র টানাটানির হৈহল্লোড়, সব মিলিয়ে একটা আনন্দোৎসবের মতো অবস্থা।

হারুন ইঞ্জিনিয়ার বলেছিলেন ছয় মাসের মাঝে স্কুলঘর দাঁড় করিয়ে দেবেন। অবিশ্বাস্য ব্যাপার— সত্যি সত্যি ছয় মাসের আগেই সবগুলি স্কুলঘর দাঁড়িয়ে গেল। দরজা-জানালা, ব্ল্যাকবোর্ড, বেঞ্চ, চেয়ার-টেবিল সবকিছু একসাথে। উজ্জ্বল রং দিয়ে

সবকিছু রং করা হয়েছে, এত সুন্দর রং দেখলেই মন ভালো হয়ে যায়। সবারই কাজকর্মে খুব উৎসাহ। ছয় মাসের আগেই সব শেষ হয়ে যাবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কাজকর্ম মোটামুটি শেষ, এখন সেগুলি স্কুলের জায়গায় নিয়ে লাগিয়ে দেয়া— সেটা নাকি একেবারে সহজ একটা কাজ, হারুন ইঞ্জিনিয়ারের ভাষায় একেবারে পাবদা মাছের ঝোল!

ঠিক তখন হঠাৎ রাতের খবরে শোনা গেল সমুদ্রে একটা নিম্নচাপ দেখা দিয়েছে, একটা ঘূর্ণিঝড় এগিয়ে আসছে। এখনও সেটা সমুদ্রের গভীরে, কিন্তু দুদিনের মাঝে এসে এখানে ঝাপটা দেবে। হারুন ইঞ্জিনিয়ার মাথা চুলকে বললেন, "অবস্থা গুরুতর।"

ফারুক বখত জিজ্ঞেস করলেন, "কেন, কী হয়েছে?"

"প্লাস্টিজনার এক নম্বর গুণ হচ্ছে এটা হালকা। আস্ত একটা স্কুলঘর দুইজন মানুষ মিলে টেনে নিয়ে যেতে পারে! তার মানে বুঝেছ?"

ফারুখ বখত মাথা চুলকে বললেন, "না, বুঝি নি।"

"তার মানে ঘরগুলি যদি ঠিক করে বেঁধেছেঁদে রাখা না হয় তাহলে ঝড়ে সেগুলি উড়ে একেবারে গারো পাহাড়ে গিয়ে পড়বে!"

"তা হলে, বেঁধেছেঁদে রাখলেই হয়।"

হারুন ইঞ্জিনিয়ার তাঁর ভারী চশমা খুলে শার্টের হাতায় মুছতে মুছতে বললেন, "আমি অন্য একটা জিনিস ভাবছি।"

"কী জিনিস?"

"সবগুলি স্কুলঘর তৈরি হয়ে গেছে, এগুলিকে এখন শক্ত করে বাঁধাছাঁদা করতে যত সময় লাগবে সবগুলিকে স্কুলের মাঠে নিয়ে পাকাপাকিভাবে বসিয়ে দিতে মোটামুটি একই সময় লাগবে।"

"সত্যি?"

"সত্যি। আমি তাই ভাবছি এক কাজ করলে কেমন হয়?"

"কী কাজ?"

"ঘূর্ণিঝড় আসার আগেই স্কুলঘরগুলিকে স্কুলের মাঠে নিয়ে পাকাপাকিভাবে বসিয়ে দিলে কেমন হয়?"

"এখনই?"

"হ্যাঁ।"

ফরাসত আলি আর ফারুখ বখত দুজনেই এতদিনে এর মাঝে টের পেয়েছেন হারুন ইঞ্জিনিয়ারের মাথায় একটা-কিছু ঢুকে গেলে সেটা সেখান থেকে বের করা খুব সহজ না। প্রথম প্রথম চেষ্টা করেছিলেন, আজকাল আর চেষ্টা করেন না। ফারুখ বখত বললেন, "ঠিক আছে তা হলে কাজ শুরু করে দেয়া যাক!"

হারুন ইঞ্জিনিয়ার তার ভারী চশমার কাচ শার্টের হাতা দিয়ে মুছতে মুছতে বললেন, "কাজ খুব সহজ, একেবারে পাবদা মাছের ঝোল! সবকিছুতে নাম্বার দেয়া আছে। এক নম্বরের সাথে এক নম্বর, দুই নম্বরের সাথে দুই নম্বর, তিন নম্বরের সাথে তিন নম্বর এইভাবে লাগিয়ে যাবে দেখতে দেখতে কাজ শেষ হয়ে যাবে।"

ফরাসত আলি তার দাড়ি চুলকাতে চুলকাতে বললেন, "তা হলে আর দেরি করে কাজ নেই, লোকজন ডেকে কাজ শুরু করে দিই।"

বাইরে আকাশে তখন মেঘ করেছে, একটু একটু ঠাণ্ডা বাতাস এবং খুব সূক্ষ্ম বোঝা যায় না এরকম বৃষ্টি। কিন্তু তাতে কেউ পিছপা হল না এবং তার মাঝে কাজ শুরু হয়ে

গেল। একটা ট্রাক, কয়েকটা গোরুর গাড়ি এবং বেশকিছু রিকশা দিয়ে স্কুলঘরগুলি তুলে নেয়া হল। মাঠের মাঝে আগে থেকে দাগ কাটা ছিল সেখানে বসিয়ে সেগুলিকে মোটা মোটা স্ক্রু দিয়ে গেঁথে দেয়া আরম্ভ হল। কাজ শুরু করার কিছুক্ষণের মাঝেই আকাশ ধীরে ধীরে একেবারে পুরোপুরি অন্ধকার হয়ে তুমুল বৃষ্টি শুরু হল। দমকা বাতাসটাও মনে হয় বেড়ে গেল কয়েকগুণ। কিন্তু একবার কাজ শুরু করে দেয়া হয়েছে, এখন থামার উপায় নেই। দিনের বেলাতেই মোটামুটি অন্ধকার, বড় বড় কয়েকটা টর্চলাইট হাতে সবাই কাজ করতে থাকে। সবার গায়েই একটা করে রেনকোট রয়েছে কিন্তু তবু সবাই ভিজে একেবারে চুপসে গেল।

এরকম ঝড়বৃষ্টিতে আদৌ এ ধরনের কাজ করা সম্ভব সেটা বিশ্বাস করা শক্ত। কিন্তু হারুন ইঞ্জিনিয়ারের কাজ মোটামুটি নিখুঁত। সবকিছুর মাঝে বড় বড় উজ্জ্বল রঙের নাম্বার দেয়া রয়েছে, নাম্বারগুলি মিলিয়ে একটার মাঝে আরেকটা শুধু স্ক্রু দিয়ে এঁটে দেয়া। টর্চলাইট জ্বালিয়ে বৃষ্টিতে ভিজে সবাই কাজ করতে থাকে এবং দেখতে দেখতে স্কুলঘর দাঁড়িয়ে যেতে থাকে।

দিনের আলো নিভে আরও অন্ধকার হয়ে এল, চারিদিকে মোটামুটি ঘুটঘুটে অন্ধকার। তার মাঝে সবাই হৈচৈ করে কাজ করতে থাকে। দমকা হাওয়া আরও বেড়েছে, মাঝে মাঝে মনে হয় সবকিছু উড়িয়ে নেবে, কিন্তু সবাই মিলে শক্ত করে ধরে রেখে স্ক্রু এঁটে দিতে থাকে। ঝড়বৃষ্টি না হলে এই কাজটি আরও অনেক সহজে করা যেত, দিনের আলো হলে ঠিক কীভাবে পুরো জিনিসটি দাঁড় হচ্ছে দেখা যেত। কিন্তু এখন তার কোনো উপায় নেই। হারুন ইঞ্জিনিয়ারের সংখ্যাকে অঙ্কের মতো বিশ্বাস করে সবাই কাজ করে যেতে থাকে।

ভোররাতের দিকে শেষ স্ক্রুটি লাগিয়ে হারুন ইঞ্জিনিয়ার একটা জয়ধ্বনির মতো শব্দ করলেন। উপস্থিত যারা ছিল তারাও সবাই আনন্দে চিৎকার করতে থাকে। পুরো কাজটুকু শেষ হয়েছে। কেউ সত্যি সত্যি বিশ্বাস করেনি যে এই কাজটি সত্যি কখনো শেষ হবে।

বাসায় যখন সবাই ফিরে এসেছে তখন আর কারও গায়ে তিল পরিমাণ জোর অবশিষ্ট নেই। ভিজে কাপড় পালটে শুকনো কাপড় পরে যে যেখানে ছিল সেখানেই লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল।

সারারাত ঝড়ের বেগ বাড়তে থাকে, সবাই সন্দেহ করতে থাকে যে হয়তো আবার একটা ভয়ংকর ঘূর্ণিঝড় আসছে। কিন্তু দেখা গেল শেষ মুহূর্তে ঘূর্ণিঝড়টা তার দিক পালটে জনবিরল একটা অংশের দিকে গিয়ে হাজির হয়েছে। সকালবেলা ঝড় কমে গিয়ে মোটামুটি শান্ত আবহাওয়া ফিরে এল। ফরাসত আলি, ফারুখ বখত আর হারুন ইঞ্জিনিয়ার টানা ঘুমে দিন কাবার করে দিতে পারতেন, কিন্তু একটু বেলা হতেই অনেক মানুষের হৈচৈ শুনে তাদের উঠে পড়তে হল। দরজা খুলে দেখেন অনেক মানুষজন তাঁদের বাসার সামনে, সবাই একসাথে তাঁদেরকে কিছু-একটা বলতে চাইছে বলে কিছুই আর শুনতে পাচ্ছেন না। তারা গতরাতে যে স্কুলটা দাঁড় করিয়েছেন সেটা নিয়ে কিছু-একটা বলছে। লোকজনের কথা শুনে কিছু বুঝতে না পেরে তাঁরা তাদের স্কুলের দিকে রওনা দিলেন, তাঁদের বাসার খুব কাছে, হেঁটে যেতে দশ মিনিট।

মোড়টা ঘুরতেই তাদের স্কুলটা চোখে পড়ল। উজ্জ্বল রং, গতরাত্রে বৃষ্টিতে ধুয়ে এখন একেবারে ঝকমক করছে। সবুজ মাঠের উপর দাঁড়িয়ে আছে দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। গাঢ় লাল রঙের ছাদ, হালকা নীল রঙের দেয়াল, জানালা আর দরজায় কচুপাতা সবুজ

রং। কাচের জানালা দিয়ে ভিতরের উজ্জ্বল ধবধবে সাদা দেয়াল দেখা যাচ্ছে। দেয়ালে ব্ল্যাকবোর্ড, মেঝেতে পাকাপাকিভাবে লাগানো চেয়ার টেবিল বেঞ্চ। কী সুন্দর উজ্জ্বল তাদের রং দেখলেই মনের মাঝে আনন্দ হতে শুরু করে। পুরো স্কুলটিতে কোনো ত্রুটি নেই, এক কথায় অপূর্ব। শুধু একটিমাত্র সমস্যা—

পুরো স্কুলটি দাঁড়িয়ে আছে কাত হয়ে। রাতের অন্ধকারে তাড়াহুড়ো করে লাগানোর সময় কেউ লক্ষ করেনি যে অংশটি পূর্ব থেকে পশ্চিমে বিস্তৃত হওয়ার কথা ছিল সেটা নিচে থেকে উপরে বিস্তৃত হয়ে আছে। দেখে মনে হচ্ছে কোনো এক বিশাল দৈত্য বুঝি স্কুলটিকে মাটি থেকে তুলে কাত করে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

হারুন ইঞ্জিনিয়ার তার ভারী কাচের চশমা খুলে শার্টের হাতা দিয়ে মুছতে মুছতে বললেন, "শালার এক নম্বর অংশটা ডাইনে বামে রাখার কথা ছিল, রেখেছি উপরে নিচে— পুরোটাই এখন উপর নিচ হয়ে গেছে!"

ফরাসত আলী এবং ফারুখ বখত হা করে মাটি থেকে আকাশের দিকে উঠে যাওয়া কাত হয়ে থাকা স্কুলের দিকে তাকিয়ে রইলেন!

৩

সবাই মিলে যখন কাত হয়ে থাকা স্কুলের দিকে তাকিয়ে আছেন তখন ভিড় ঠেলে একজন মানুষ এগিয়ে এলেন। মানুষটিকে দেখলে প্রথমেই যে-কথাটি বলতে হয় সেটা হচ্ছে যে মানুষটা মোটা। কোনো মানুষ যদি কানা খোঁড়া হয় কখনো তাকে কানা খোঁড়া বলতে হয় না। কোনো মানুষ যদি মোটা হয় তাকেও মোটা বলা ঠিক নয়, কিন্তু এই মানুষটিকে মোটা না বলে কোনো উপায় নেই। তাঁর হাত পা মোটা মোটা থামের মতো, তাঁর বিশাল পেট উঁচু হয়ে আছে। তাঁর বিশাল মুখে মোটা মোটা গাল চোখ নাক মুখ মনে হয় অনেক কষ্ট করে কোনোরকমে সেখানে টিকে আছে। মানুষটি একটু হাঁটলেই তাঁর সারা শরীরের মেদ মাংস ভুঁড়ি থরথর করে কাঁপতে থাকে। মানুষটি ভিড় ঠেলে সামনে এসে হাঁপাতে লাগলেন। মানুষটি এত মোটা যে তার এই বিশাল শরীর নিয়ে একপা হাঁটা শুকনো পাতলা একজন মানুষের দুই মাইল দৌড়ে আসার সমান। খানিকক্ষণ বড় বড় নিশ্বাস নিয়ে মোটা মানুষটি বললো, "এখানে ফরা ভাই ফারু ভাই আর হারু ভাই কে?"

ফরাসত আলি বললেন, "আমি ফরাসত আলি।"

ফারুখ বখত বললেন, "আমি ফারুখ বখত।"

হারুন ইঞ্জিনিয়ার বললেন, "আমি হারুন ইঞ্জিনিয়ার।"

মোটা মানুষটি বড় বড় দুইটা নিশ্বাস নিয়ে বললেন, "আমার নাম মীর্জা মাস্টার।" কথাটি বলেই তাঁর নিশ্বাস ফুরিয়ে গেল, তিনি মুখ হাঁ করে নিশ্বাস নিতে লাগলেন।

ফারুখ বখত জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কিসের মাস্টার?"

"বাচ্চাদের। আমি বাচ্চাদের পড়াই।"

"কোথায় পড়ান?"

"স্কুলে।"

"কোথায় স্কুল?"

"স্কুল নেই।"

"স্কুল নেই? ফারুখ বখত অবাক হয়ে বললেন, বুঝতে পারলাম না, আপনি স্কুলে পড়ান, কিন্তু আপনার স্কুল নেই?"

"ছিল। স্কুল ছিল। গতরাতে ঝড়ে উড়ে গেছে।"

ফরাসত আলি বললেন, "গতরাতে তো বেশি বড় ঝড় হয়নি! এই ঝড়ে স্কুল উড়ে গেল?"

মীর্জা মাস্টার তখন একটু হাসার চেষ্টা করে বললেন, "খুব দুর্বল স্কুল ছিল। বাঁশের চাটাই দিয়ে ঢেকে উপরে একটা ছাউনি। আমি জোরে একটা হাঁচি দিলে স্কুল উড়ে যায় সেরকম অবস্থা।"

একসাথে অনেকগুলি কথা বলে ফেলে মীর্জা মাস্টার মুখ বড় বড় করে নিশ্বাস নিতে লাগলেন।

হারুন ইঞ্জিনিয়ার চশমা খুলে কাচটা খুব মনোযোগ দিয়ে খানিকক্ষণ পরিষ্কার করে বললেন, "কীরকম স্কুল আপনার?"

"গরিব বাচ্চাদের। যেসব বাচ্চাকাচ্চা রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়ায়, মিন্‌তি টোকাইয়ের কাজ করে তাদের স্কুল।"

হঠাৎ করে ফারুখ বখত, ফরাসত আলি আর হারুন ইঞ্জিনিয়ার তিনজন একসাথে মীর্জা মাস্টারের দিকে ঘুরে তাকালেন। ফারুখ বখত কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি গরিব বাচ্চাদের পড়ান?"

"হ্যাঁ।"

"আপনার স্কুলের খরচ কে দেয়?"

"আমার স্কুলের কোনো খরচ নাই, কেউ দেয় না। বাচ্চারা আসে আমি তাদের পড়াই।"

"কী পড়ান?"

"প্রথমে পড়তে শেখাই। তারপরে অঙ্ক। তারপরে যে যেটা পড়তে চায়। কেউ ইংরেজি, কেউ সায়েন্স।"

"আপনার কতজন ছাত্র?"

"ঠিক নাই। ধান কাটার মৌসুমে কমে যায়। বৃষ্টি-বাদলার দিনে একটু বেশি হয়। অনেক রকম ছাত্র আমার, কেউ বাসায় কাজ করে, কেউ মিন্‌তি, কেউ মুটে, কেউ টোকাই। কেউ রেলস্টেশনে কুলি। দুইজন আছে পকেটমার।"

"পকেটমার?"

"জি। এইখানে পকেটমারদের একটা কলেজ আছে, দুইজন এখনই চান্স পেয়ে গেছে। চমৎকার হাতের কাজ। আপনার পকেট খালি করে দেবে আপনি টের পর্যন্ত পাবেন না। কলেজের প্রিন্সিপাল বলেছে এই দুইজন নাকি বড় হয়ে কলেজের সুনাম রাখবে।"

"আপনি পকেটমার কলেজের প্রিন্সিপালকে চেনেন?"

"না, ব্যক্তিগত পরিচয় নাই। তারা পরিচয় গোপন রাখে। আমি লোকমুখে খবর পাই।"

ফরাসত আলি খানিকক্ষণ অবাক হয়ে মীর্জা মাস্টারের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, "এখন আপনার স্কুল উড়ে গেল, ছাত্রদের কী অবস্থা?"

"ছাত্ররা মহাখুশি। একেবারে পড়ায় মনোযোগ নাই। এরা গরিব মানুষের পোলাপান, বাসায় পড়াশোনার আবহাওয়া নেই—পুরো ব্যাপারটা মনে করে একটা ঠাট্টা-তামাশা।"

"ঠাট্টা তামাশা?"

"জি। কখনো ধমক দিয়ে কখনো আদর করে পড়াতে হয়। অনেক যন্ত্রণা।"

ফারুখ বখত জিজ্ঞেস করলেন, "এখন আপনার ছাত্ররা কোথায়?"

"এইখানেই আছে নিশ্চয়। দিনরাত সবগুলি টোটো করে ঘোরাঘুরি করে। যেখানে একটু হৈচৈয়ের খোঁজ পায় সেখানে হাজির হয়।"

মীর্জা মাস্টার মাথা ঘুরিয়ে মানুষের ভিড়ের দিকে তাকালেন, ছোট ছোট বাচ্চারা যারা ছোটাছুটি করছে তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "এই যে এরা সব আমার ছাত্র। ঐ যে বাদাম বিক্রি করছে ছেলেটা আমার একেবারে একনম্বর ছাত্র। অ্যালজেবরা শুরু করেছে। ঐ যে দূরে দুইজন কুস্তি করছে ঐ দুজনও আমার ছাত্র। স্কুল উড়ে গেছে আর পড়তে হবে না, তাদের মনে বড় আনন্দ!"

মীর্জা মাস্টার মুখ হা করে খানিকক্ষণ নিঃশ্বাস নিয়ে বললেন, "আমি খোঁজ পেয়েছি যে আপনারা একটা স্কুল তৈরি করছেন। তাই ভাবছিলাম আমার ছাত্রদের জন্যে যদি একটা ঘর পাওয়া যায়। কিন্তু এখন তো দেখি স্কুলঘর আপনারা দাঁড়া করেছেন উলটো। স্কুলের মেঝে আকাশে উঠে গেছে, দরজা জানালা আড়াআড়ি, এই স্কুলে ছাত্র ঢুকবে কোন দিক দিয়ে আর মাস্টার ঢুকবে কোন দিক দিয়ে?"

হারুন ইঞ্জিনিয়ার গলা উঁচিয়ে বললেন, "ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে আপনার এত মাথাব্যথা কিসের?"

"ছোটখাটো?" মীর্জা মাস্টার তার ছোট ছোট চোখ দুটিকে যথাসাধ্য বড় করার চেষ্টা করে বললেন, "ছোটখাটো? একটা আস্ত স্কুল উলটা করে দাঁড় করেছেন সেটা ছোটখাটো?"

"অবশ্যি ছোটখাটো। একরাত্রে স্কুল উলটো করে দাঁড় করানো হয়েছে, আরেক রাত্রে স্কুল খুলে সোজা করা হবে।"

মীর্জা মাস্টার খানিকক্ষণ হারুন ইঞ্জিনিয়ারের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, "এক রাত্রে?"

"অবশ্যি এক রাত্রে! ভাবছেন কী আপনি? এটা আমার আবিষ্কার করা প্রসেস। আমেরিকা জার্মানি আর জাপানে এটার পেটেন্ট আছে! স্কুলঘরের দায়িত্ব আমি নিয়েছি, আমি ঠিক করে দেব—আপনি আপনার ছাত্রছাত্রী নিয়ে মাথা ঘামান।"

মীর্জা মাস্টার তখন ফরাসত আলি আর ফারুখ বখতের দিকে তাকালেন, ইতস্তত করে বললেন, "কী মনে হয় আপনাদের? স্কুলঘরটা যখন শোওয়ানো হবে তখন কি একটা ঘর পাওয়া যাবে আমার ছাত্রছাত্রীর জন্যে—"

ফারুখ বখত বললেন, "আপনি এটা কী বলছেন?"

মীর্জা মাস্টার থতমত খেয়ে বললেন, "না মানে ভাবলাম এত বড় একটা স্কুল তার একটা ছোট ঘর যদি দিতেন। কিন্তু আপনাদের যদি অসুবিধে হয় তা হলে থাক—"

ফারুখ বখত মেঘস্বরে বললেন, "না-না-না, আমি মোটেও সেটা বলছি না। আমি বলছি আপনি শুধু একটা ঘর কেন চাইছেন, এই পুরো স্কুল আমরা দিয়ে দেব আপনার ছাত্রছাত্রীদের—"

"পু-পু-পুরো স্কুল?"

"পুরো স্কুল। ফারুখ বখত ফরাসত আলির দিকে তাকিয়ে বললেন, দিয়ে দেব না পুরো স্কুল?"

ফরাসত আলি মাথা নাড়লেন, "অবশ্যই পুরো স্কুল দিয়ে দেব। স্কুলঘর শেষ হবার আগেই আমাদের ছাত্র খুঁজে বের করার কথা ছিল, এখন আমাদের আর ছাত্র খুঁজে বের করতে হবে না। না চাইতেই পেয়ে গেলাম।" ফরাসত আলি আনন্দে দাঁত বের করে হাসলেন, সাধারণত তিনি হাসলে দাড়িগোঁফের আড়ালে তার দাঁত ঢেকে থাকে, এবারে ঢেকে থাকল না, বেশ খানিকটা বের হয়ে গেল।

মীর্জা মাস্টারের ছোট ছোট চোখগুলি গোল হয়ে গেল, খানিকক্ষণ তিনি কথা বলতে পারলেন না, বড় বড় কয়েকটা নিশ্বাস নিয়ে কোনোমতে বললেন, "পু-পু-পুরো স্কুলটা আমার ছাত্রছাত্রীর জন্যে দিয়ে দেবেন? আমার এইসব গরিব মিস্‌তি মুটে ছাত্রদের? কাজের ছেলে, টোকাইদের?"

ফরাসত আলি মাথা নাড়লেন।

মীর্জা মাস্টার খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, "আসলে ঠাট্টা করছেন, তাই না? আসলে এটা বড়লোকের বাচ্চাদের জন্যে স্কুল। তারা যেন পাশ করেই বিলাত আমেরিকা যেতে পারে। তাই না?"

ফারুখ বখত মাথা নেড়ে বললেন, "না। আজ থেকে এটা আপনার ছাত্রদের স্কুল।"

মীর্জা মাস্টার হঠাৎ তার বিশাল শরীর নিয়ে থপথপ করে স্কুলের মাঠে ছুটে যেতে থাকলেন। মাঠের মাঝামাঝি গিয়ে তিনি হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বললেন, "পথচারী স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা—"

হঠাৎ উপস্থিত লোকজনের মাঝে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা অনেকগুলি বাচ্চা মীর্জা মাস্টারকে ঘিরে দাঁড়াল, তাদের পায়ে জুতো নেই, শরীরে কাপড় নেই, ছোট কয়েকজনের নাক থেকে সর্দি ঝরছে। কয়েকটি বাচ্চা মেয়ে, তাদের কোলে আরও ছোট ন্যাদান্যাদা বাচ্চা।

মীর্জা মাস্টার তাঁর ছাত্রদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "এই যে দেখছ স্কুলঘর উপুড় হয়ে শুয়ে আছে, এই স্কুল এখন থেকে তোমাদের।"

"আমাদের?"

"হ্যাঁ।"

"খোদার কসম?"

মীর্জা মাস্টার হুংকার দিয়ে বললেন, "কথায়-কথায় তোমাদের সাথে আমার কসম কাটতে হবে? বলেছি বিশ্বাস হয় না?"

উপস্থিত বাচ্চাগুলি মাথা নাড়ল, না তাদের বিশ্বাস হয় না।

মীর্জা মাস্টার হাঁসফাঁস করতে করতে বললেন, "আমি তোমাদের শিক্ষক। শিক্ষক হচ্ছে বাবার মতো। বাবারা কি তার ছেলেমেয়েকে মিথ্যা কথা বলে?"

উপস্থিত বেশির ভাগ ছেলেমেয়েরা মাথা নেড়ে বলল, "জ্বে, বলে।"

মীর্জা মাস্টার হুংকার দিয়ে বললেন, "কিন্তু আমি বলি না।। এটা তোমাদের স্কুল।"

কালো ঢ্যাঙামতন একজন বলল, "আমরা যদি দালানটা ছুঁই তা হলে সাহেবেরা রাগ করবে না?"

"না, রাগ করবে না।"

"গিয়ে ছুঁয়ে দেখব?"

"যাও দ্যাখো।"

বলামাত্র একটা বিচিত্র ব্যাপার ঘটল, হঠাৎ করে পুরো শিশুর দল স্কুলঘরের দিকে ছুটে যায়। তারা স্কুলঘরের কাত হয়ে শুয়ে থাকা দালানটি ছুঁয়ে দেখে। একজন দুজন দরজা-জানালা বেয়ে উপর উঠতে শুরু করে। কয়েকজন আড়াআড়িভাবে বসানো দরজায় ফাঁক দিয়ে নিচের একটা ক্লাসঘরে ঢুকে যায়। কাত হয়ে থাকা জানালার ফাঁক দিয়ে দেখা যায় বাচ্চাগুলি দেয়াল থেকে বের হয়ে থাকা বেঞ্চে ঝুলছে। ঘরের ভেতর থেকে হৈচৈ এবং আনন্দধ্বনি শোনা যেতে থাকে।

ফরাসত আলি অবাক হয়ে বললেন, "ঢুকল কেমন করে ভিতরে?"

ফারুখ বখত হাসিমুখে বললেন, "ছোট বাচ্চাদের ব্যাপার! তাদের অসাধ্য কিছু নাই।"

সত্যি সত্যি তাদের অসাধ্য কিছু নেই। দেখা গেল বাচ্চাগুলি দেয়াল খিমচে ধরে উপরে উঠে যাচ্ছে। পিছনে একটা বাচ্চাকে ঝুলিয়ে একটা ছোট মেয়ে বিপজ্জনকভাবে একটা জানালা দিয়ে ঢুকে গেল। কয়েকজনকে দেখা গেল একটা দরজা দিয়ে ঝুলতে ঝুলতে ভিতরে কোথায় জানি লাফিয়ে পড়ছে। ছোট ছোট কয়েকটি শিশুকে ছুটতে দেখা গেল, মনে হল একজন তাদেরকে দৌড়ে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ করে কালোমতন একটা বাচ্চা একটা জানালা দিয়ে লাফিয়ে বের হল, উপর থেকে নিচে পড়তে পড়তে সে নিজেকে সামলে নিল, দেয়াল বেয়ে পিছলে সে নিচে নেমে আসতে থাকে। দেখে মনে হয় ছেলেটির ভয়ংকর ফূর্তি হচ্ছে।

হারুন ইঞ্জিনিয়ার তাঁর চশমা মুছতে মুছতে পাংশুমুখে বললেন, "ছেলেগুলি পড়ে ব্যথা পাবে না তো?"

ফারুখ বখত ভুরু কুচকে বললেন, "শুধু ছেলে বলছ কেন? কমপক্ষে একডজন মেয়েও আছে ওখানে। ওই দ্যাখো, ঘাড়ে একটা বাচ্চা নিয়ে কীভাবে লাফ দিল! ইশ! ফারুখ বখত আতঙ্কে তার চোখ বন্ধ করে ফেললেন।"

ফরাসত আলি বললেন, "আমাদের কথা তো শুনবে বলে মনে হয় না।"

হারুন ইঞ্জিনিয়ার মাথা নাড়লেন, "না। শুনবে না।"

ফরাসত আলি তাঁর দাড়ি চুলকাতে চুলকাতে বললেন, "মীর্জা মাস্টারের কথা শুনবে, হাজার হলেও তাদের শিক্ষক। তাঁকে বলতে হবে।"

ফরাসত আলি হন্তদন্ত হয়ে মাঠের মাঝে হেঁটে যেতে লাগলেন, তাঁর পিছুপিছু ফারুখ বখত, ফারুখ বখতের পিছুপিছু হারুন ইঞ্জিনিয়ার। এই তিনজনকে হেঁটে আসতে দেখে মীর্জা মাস্টার তাঁদের দিকে তাকালেন, তাঁর গোলগাল মুখে নাক চোখ মুখ এত ছোট ছোট দেখায় যে সেখানে কোনো ধরনের অনুভূতিরই ছাপ পড়ে না। তাঁর স্কুলের ছাত্রছাত্রীর কাজকর্ম দেখে তিনি কতটুকু ভয় পেয়েছেন বোঝা গেল না। ফরাসত আলি বললেন, "মীর্জা মাস্টার! আপনার কি মনে হয় না যে ছেলেমেয়েগুলি যেভাবে লাফঝাঁপ দিচ্ছে—"

"ঠিকই বলেছেন।" মীর্জা মাস্টার মাথা নেড়ে বললেন, "ছেলেমেয়েগুলি যেভাবে লাফঝাঁপ দিচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে তাদের স্কুলটা অসম্ভব পছন্দ হয়েছে।"

"আমি সেটা বলছি না।" ফরাসত আলি মাথা নেড়ে বললেন, "আমি যেটা বলতে যাচ্ছি—"

"বুঝেছি আপনি কী বলতে চাচ্ছেন।" মীর্জা মাস্টার একগাল হেসে বললেন, "আমিও ঠিক এই কথাটাই বলতে চাচ্ছি। স্কুলঘরটা এইভাবে কাত হয়েই থাকুক! এটাকে সোজা করে কাজ নেই।"

হারুন ইঞ্জিনিয়ার চোখ কপালে তুলে বললেন, "কী বললেন? স্কুলটাকে সোজা করে কাজ নেই?"

"না! এই ছেলেপিলেরা কিছুতেই স্কুলঘরে ঢুকতে চায় না। আমার সবচেয়ে বড় সমস্যা স্কুলঘরের মাঝে ঢোকানো, কিন্তু কাত হয়ে থাকা এই স্কুলঘর দেখে এরা এত মজা পেয়েছে আমার মনে হয় স্কুলটা এভাবে রেখে দিলেই হয়। সবাই তা হলে প্রত্যেকদিন স্কুলে আসবে।"

ফরাসত আলি খানিকক্ষণ অবাক হয়ে মীর্জা মাস্টারের দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর কয়েকবার চেষ্টা করে বললেন, "স্কুলটা ঠিক করা হবে না? এইভাবে কাত হয়ে থাকবে? দরজা-জানালা আড়াআড়ি? মেঝে আকাশে উঠে যাচ্ছে?"

মীর্জা মাস্টার আবার একগাল হেসে বললেন, "হ্যাঁ।"

হারুন ইঞ্জিনিয়ার তাঁর চশমা খুলে জোরে জোরে কাচ পরিষ্কার করতে করতে বললেন, "আপনি আসলে আমাদের সাথে মশকরা করছেন, তাই না?"

মীর্জা মাস্টার তার ছোট ছোট চোখ দুটিকে যতদূর সম্ভব উপরে তুলে বললেন, "আমি কখনো মশকরা করি না। সত্যি সত্যি বলছি।"

ফারুখ বখত খানিকক্ষণ কাত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা স্কুলটাকে দেখলেন, বাচ্চাদের হৈচৈ আনন্দোল্লাস শুনলেন, তারপর মীর্জা মাস্টারের দিকে তাকিয়ে বললেন, "যদি পড়ে ব্যথা পায়?"

"পাবে না।" মীর্জা মাস্টার মাথা নেড়ে বললেন, "ব্যথা পাবে না। এরা চলন্ত ট্রেন থেকে লাফিয়ে নামে, স্টিমার থেকে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তরতর করে সুপারি গাছ বেয়ে উঠে যায়— এরা কখনো পড়ে ব্যথা পাবে না। এরা বড়লোকের ন্যাদা ন্যাদা বাচ্চা না, এদের নিয়ে কোনো চিন্তা করবেন না।"

ফারুখ বখত বললেন, "ঠিক আছে, তা হলে কয়েকদিন স্কুলঘরটাকে এভাবেই রাখা যাক। এটাকে সোজা করার এত তাড়াহুড়ো কী?"

মীর্জা মাস্টার জোরে জোরে মাথা নেড়ে বড় বড় করে নিশ্বাস নিতে লাগলেন।

ফরাসত আলি স্কুলঘরটার দিকে তাকিয়ে একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, "ঠিক আছে তা হলে থাকুক এইভাবে।"

হারুন ইঞ্জিনিয়ার হঠাৎ করে খুব রেগে উঠলেন, গলা উঁচিয়ে বললেন, "তোমাদের সবার মাথা-খারাপ হয়েছে, তা-ই না?"

ফারুখ বখত বললেন, "কেন? মাথা-খারাপ হবে কেন? মীর্জা মাস্টার এত করে চাইছেন, তাই কয়েকদিন স্কুলটাকে এভাবে রাখা হচ্ছে, তার বেশি কিছু না।"

"আর আমার মান-সম্মান? লোকজন বলাবলি করবে হারুন ইঞ্জিনিয়ার ঘরবাড়ি তৈরি করে উলটো। এরপর আমার কাছে কেউ কোনোদিন আসবে?"

"আসবে না কেন? একশোবার আসবে।" ফারুখ বখত সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "এটা তো পাকাপাকিভাবে রাখা হচ্ছে না। কয়েকদিনের জন্যে রাখা হচ্ছে।"

হারুন ইঞ্জিনিয়ার নাক দিয়ে ফোঁৎ করে একটা শব্দ করে খুব রেগেমেগে চুপ করে রইলেন।

পরদিন ভোরে স্কুলের আশেপাশে অনেক ভিড়। এলাকার যত বাচ্চা ছেলেপিলে আছে তারা সবাই চলে এসেছে। কীভাবে কীভাবে জানি খবর চলে গেছে যে এই স্কুলঘরে পড়াশোনা শুরু হয়েছে। ভিড়ের বেশির ভাগ অবিশ্যি মজা দেখার জন্যে এসেছে, সবাই

স্কুলটাকে ঘিরে জটলা পাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পান-সিগারেটের দোকান বেশ কয়েকটা খুলে গেছে, ঝালমুড়ি এবং চানাচুর নিয়ে কিছু ছেলেপিলে ঘুরে বেড়াচ্ছে, স্কুলের ঘন্টা বেজে উঠলে তারাও নাকি ক্লাসঘরে ঢুকে পড়বে। কৌতূহলী দর্শক ছাড়াও রয়েছে খবরের কাগজের সাংবাদিক। ক্যামেরা নিয়ে ছবি তুলে তারা, নোটবইয়ে কীসব লেখালেখি করছে। টেলিভিশন থেকেও লোক এসেছে, মস্ত বড় ভিডিও ক্যামেরা নিয়ে তারা এক কোনায় দাঁড়িয়ে আছে।

সকাল আটটা বাজতেই বিশাল একটা ঘন্টা বাজিয়ে দেয়া হল এবং হঠাৎ করে দেখা গেল পিলপিল করে নানা আকারের ছাত্রছাত্রীরা দল বেঁধে স্কুলঘরের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। তারা দেয়াল খিমচে খিমচে সুপারি গাছের মতো স্কুলঘর বেয়ে উঠতে থাকে এবং আড়াআড়ি দরজা-জানালার মাঝে দিয়ে ভিতরে ঢুকতে শুরু করে। বাচ্চাদের হৈচৈ এবং আনন্দ-চিৎকারে জায়গাটা কিছুক্ষণের জন্যে সরগরম হয়ে যায়। স্কুলঘরের দরজা-জানালা ছাদ এবং মেঝের মাঝে দিয়ে দুরন্ত ছেলেরা লাফঝাঁপ দিতে থাকে এবং বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা বিশাল জনতা সার্কাস দেখার মতো সেটা উপভোগ করতে থাকে। লোকজনের হৈচৈ দেখে জায়গাটাকে ঠিক স্কুলের মতো মনে না হয়ে একটা বাজারের মতো মনে হচ্ছিল।

উপস্থিত সব লোকজন হঠাৎ করে চুপ করে যায়— দেখা গেল মীর্জা মাস্টার তাঁর বিশাল দেহ নিয়ে থপথপ করে এগিয়ে আসছেন। তিনি কীভাবে কাত হয়ে থাকা এই স্কুলঘরের দেয়াল খিমচে খিমচে উপরে উঠবেন সেটি দেখার জন্যে বিশাল জনতা রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে থাকে।

মীর্জা মাস্টার স্কুলঘরের নিচে দাঁড়িয়ে ফ্যাকাশে মুখে একবার উপরে তাকালেন। কয়েক পা এগিয়ে তিনি স্কুলঘরের প্রায়-মসৃণ দেয়ালটি স্পর্শ করে হঠাৎ করে বুঝতে পারলেন হিসেবে একটি ছোট গোলমাল হয়ে গেছে। স্বাভাবিক ঘরের স্বাভাবিক দরজা দিয়েই তাঁকে মোটামুটি কসরত করে ঢুকতে হয়, এই কাত হয়ে থাকা স্কুলের দেয়াল বেয়ে উপরে উঠে আড়াআড়ি দরজা দিয়ে ভিতরে ঢোকা তার জন্যে একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার। সোজা রাস্তায় দশ পা হাঁটলেই তাঁকে খানিকক্ষণ বসে নিশ্বাস নিতে হয়, এই স্কুলঘরের দেয়াল বেয়ে ওঠার চেষ্টা করলে তাঁর হার্টফেল করে মরে যাওয়া বিচিত্র কিছু না।

স্কুলের উপর থেকে নানা-ধরনের ছাত্রছাত্রীরা দরজা-জানালা এবং ফাঁকফোকর দিয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে তাঁকে ডাকাডাকি করতে থাকে, মীর্জা মাস্টার ঠিক কী করবেন বুঝতে না পেরে ফ্যালফ্যাল করে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

ফারুখ বখত, ফরাসত আলি এবং হারুন ইঞ্জিনিয়ার অন্যান্য কৌতূহলী মানুষদের সাথে দাঁড়িয়ে পুরো ব্যাপারটি লক্ষ করছিলেন এবং মীর্জা মাস্টারের বিশাল দেহটিকে উপরে তোলার জটিল সমস্যাটার কথা তাঁরাও মোটামুটি একই সাথে বুঝতে পারলেন। ফারুখ বখত গলা নামিয়ে বললেন, "এখন কী করা যায়? এত মানুষজন দাঁড়িয়ে দেখছে যদি শিক্ষক ছাত্রদের কাছে যেতে না পারে তা হলে তো খুব লজ্জার ব্যাপার হবে।"

হারুন ইঞ্জিনিয়ার রেগে উঠে বললেন, "তখনই বলেছিলাম এরকম পাগলামি করতে যাবেন না, স্কুলঘরটাকে সোজা করেন—কিন্তু আমার কথা শুনলেন না।"

ফরাসত আলি বললেন, "এখন তো রাগ-গোস্বার সময় না, এখন হচ্ছে ক্রাইসিসের সময়। কিছু-একটা বুদ্ধি বের করো তাড়াতাড়ি।"

হারুণ ইঞ্জিনিয়ার মাথা চুলকে বললেন, "বুদ্ধি বের করার কী আছে? একটা কপিকল বেঁধে মীর্জা মাস্টারকে টেনে তুলতে হবে উপরে।"

"আছে কপিকল?"

"হ্যাঁ, আছে কয়েকটা। শক্ত নাইলনের দড়িও আছে।"

"তাহলে আর সময় নষ্ট করে কাজ নেই। শুরু করে দাও।"

হারুন ইঞ্জিনিয়ার গম্ভীর হয়ে বললেন, "সমস্যার সমাধান না করে সেটাকে রেখে দিতে হয় না, সেটা শুধু নতুন সমস্যা তৈরি করে।"

ফরাসত আলি দাঁত বের করে হেসে বললেন, "যদি কোনো সমস্যা না থাকে তা হলে আর বেঁচে থাকার আনন্দ কোথায়?"

কিছুক্ষণের মাঝেই দেখা গেল স্কুলঘরের উপরে শক্ত করে একটা কপিকল লাগানো হয়েছে। তার ভিতর দিয়ে নাইলনের শক্ত দড়ি ঢোকানো হয়েছে, দড়ির এক মাথায় মীর্জা মাস্টারকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা হল, অন্য মাথায় হাত লাগাল উপস্থিত দর্শকদের প্রায় শদুয়েক উৎসাহী ভলান্টিয়ার।

হারুন ইঞ্জিনিয়ার হাতে একটা রুমাল নিয়ে একবার উপর দিকে তাকালেন, একবার মীর্জা মাস্টারের বিশাল দেহের দিকে তাকালেন, তারপর উৎসাহী ভলান্টিয়ারদের দিকে তাকিয়ে তাঁর রুমালটি নেড়ে বললেন, "মারো টান—"

শদুয়েক মানুষ একসাথে নাইলনের দড়ি ধরে হ্যাঁচকা টান মারে, সবাই আশা করেছিল মীর্জা মাস্টার বুঝি মিটারখানেক উপরে উঠে যাবেন, কিন্তু তিনি উপরে উঠলেন না। সবাই সবিস্ময়ে দেখল স্কুলঘরটি মিটারখানেক বাঁকা হয়ে গেল।

হারুন ইঞ্জিনিয়ার মাথা নেড়ে বললেন, "ভয় পাবেন না। আবার টান মারেন—"

উপস্থিত লোকজন 'হ্যাঁইয়ো' বলে আবার হ্যাঁচকা টান মারে। এবারে মীর্জা মাস্টার খানিকটা উপরে উঠলেন, শূন্য থেকে ঝুলছেন বলে তাঁকে দেখায় একটা অতিকায় মাকড়শার মতো। তাঁর হাত-পা ইতস্তত নড়তে থাকে এবং মনে হয় মাকড়শাটি উপর থেকে ঝুলছে।

উপস্থিত লোকজন প্রচণ্ড উৎসাহে আবার হ্যাঁচকা টান মারে এবং মীর্জা মাস্টার আরেকটু উপরে উঠে যান। ধীরে ধীরে তিনি উপরে উঠতে থাকেন এবং উপর থেকে তাঁর ছাত্রছাত্রীরা প্রচণ্ড চ্যাঁচামেচি করে উৎসাহ দিতে থাকে। হারুন ইঞ্জিনিয়ার তাঁর রুমাল নাড়িয়ে বলতে থাকেন, 'মারো টান', অন্য সবাই বলে 'হ্যাঁইয়ো' এবং সত্যি সত্যি মীর্জা মাস্টার উপরে উঠে এলেন। কিছুক্ষণের মাঝেই তিনি একটা দরজার কাছাকাছি পৌঁছে গেলেন এবং দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা তার অসংখ্য ছাত্রছাত্রী তাঁকে খামচে ধরে ফেলে টেনে ক্লাসঘরের মাঝে ঢুকিয়ে ফেলে। সাথে সাথে উপস্থিত দর্শকেরা চিৎকার করে হাততালি দিয়ে জায়গাটি সরগরম করে দেয়।

মীর্জা মাস্টার ক্লাসঘরে পৌঁছানোর পর ফরাসত আলি এবং ফারুখ বখত স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। ফরাসত আলি বললেন, "যাক বাবা বাঁচা গেল। প্রথমদিন স্কুল যদি ঠিক করে শুরু করা না যেত মনটা খুঁতখুঁত করত।"

ফারুখ বখত মাথা চুলকে বললেন, "স্কুল ঠিক করে হচ্ছে কি না তুই কেমন করে জানিস? হয়তো ক্লাসঘরে ঢুকতে গিয়ে মীর্জা মাস্টার ব্যথা পেয়েছেন। হয়তো লম্বা হয়ে পড়ে আছেন, ছাত্ররা পাখা দিয়ে বাতাস করছে। হয়তো ভয়ে অজ্ঞান হয়েছেন—"

ফরাসত আলি মাথা নাড়লেন, "না, মীর্জা মাস্টার ভালোই আছেন, ক্লাস নিতে শুরু করেছেন।"

"তুই কেমন করে জানিস?"

"আমি জানি। এইমাত্র ডানদিকে হেঁটে গেলেন—"

ফারুখ বখত অবাক হয়ে বললেন, "তুই কেমন করে জানিস?"

"তাকিয়ে দ্যাখ। পুরো স্কুলঘরটা ডানদিকে বাঁকা হয়ে আছে। হঠাৎ সেটা সোজা হয়ে গেল, তারপর আবার বামদিকে বাঁকা হয়ে গেল।" ফরাসত আলি দড়ি চুলকাতে চুলকাতে বললেন, "মীর্জা মাস্টার বামদিকে গেলেন।"

ফারুখ বখত এবং ফরাসত আলি সবিস্ময়ে স্কুলঘরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ দেখতে পেলেন পুরো স্কুলঘরটা একবার দুলে উঠল।

ফরাসত আলি চমকে উঠে বললেন, "কী হল হঠাৎ?"

হারুন ইঞ্জিনিয়ার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "মনে হয় মীর্জা মাস্টার একটা হাঁচি দিলেন।"

৪

পরদিন ভোরে ফারুখ বখত এবং ফরাসত আলি তাদের স্কুলের সামনে একটা বিশাল সাইনবোর্ড লাগিয়ে দিলেন। সাইনবোর্ডে বিরাট বড় করে লেখা :

পথচারী মডার্ন স্কুল

তার নিচে আরেকটু ছোট ছোট অক্ষরে লেখা :

এখানে বিনামূল্যে যে-কোনো শিশুকে সর্বাধুনিক পদ্ধতিতে শিক্ষা দেয়া হয়।

তার নিচে আরেকটু ছোট অক্ষরে লেখা :

শিশুদের বাংলা, অঙ্ক, ইংরেজি, বিজ্ঞান এবং কম্পিউটার ব্যবহার ও প্রোগ্রামিং শেখানো হয়।

তার নিচে আরেকটু ছোট অক্ষরে লেখা :

শিশুদের স্বাস্থ্যসম্মত খাবার দেয়া হয়, চিকিৎসা ও খেলাধুলার জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

তার নিচে আরেকটু ছোট অক্ষরে লেখা :

শিশুদের জাতি ধর্ম বর্ণ ও সম্প্রদায়ের ঊর্ধ্বে বিশ্বমানবিকতায় উদ্বুদ্ধ করা হয়।

তার নীচে আরেকটু ছোট অক্ষরে লেখা :

শিশুদের পারিবারিক মূল্যবোধ নৈতিকতা এবং নিয়মানুবর্তিতার শিক্ষা দেয়া হয়।

সাইনবোর্ডের নিচে আরকিছু লেখার জায়গা নেই, যদি থাকত সেখানে যে আরও কিছু লেখা হত তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

সাইনবোর্ড লাগানো শেষ হওয়ার আগেই হারুন ইঞ্জিনিয়ার এসে হাজির হলেন, নাকের উপর চশমাটি ভালো করে বসিয়ে তিনি সাইনবোর্ডের পুরো লেখাটি খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ে ভুরু কুঁচকে ফরাসত আলি এবং ফারুখ বখতের দিকে তাকালেন। ফারুখ বখত একগাল হেসে বললেন, "ভালো হয়েছে না সাইনবোর্ডটা?"

হারুন ইঞ্জিনিয়ার মাথা নেড়ে বললেন, "সাইনবোর্ডে এতসব করবে বলে লিখেছ কিন্তু তোমার মাস্টার হচ্ছে মাত্র একজন। মীর্জা মাস্টার।"

ফরাসত আলি বললেন, "মীর্জা মাস্টার একাই একশো।"

"আমি ওজনের কথা বলছি না!"

ফরাসত আলি থতমত খেয়ে বললেন, "আমি আসলে সেটা বলছিলাম না। মীর্জা মাস্টার সাংঘাতিক ভালো মাস্টার, একাই সবকিছু পড়াতে পারেন—"

"কিন্তু ঐ যে কম্পিউটার সায়েন্সের কথা লিখেছ? চিকিৎসা, খাবার— সেগুলি কে করবে?"

ফারুখ বখত মাথা চুলকে বললেন, "তার জন্যে আমাদের লোক খুঁজে বের করতে হবে। সব বিষয়ের জন্যে একজন করে শিক্ষক, একজন ডাক্তার আর একজন বাবুর্চি।"

"বাবুর্চি?"

"হ্যাঁ, বাচ্চাদের জন্যে স্বাস্থ্যসম্মত খাবার রান্না করতে হবে না?"

"এতসব করবে কখন?"

ফরাসত আলি বললেন, "কোনো চিন্তা করবে না। লটারিতে তিরিশ লাখ টাকা পেয়েছি ,পুরো টাকাটা খরচ করা হবে এই স্কুলের পিছনে!"

হারুন ইঞ্জিনিয়ার চশমা খুলে তার কাচগুলি পরিষ্কার করতে করতে বললেন, "তা ঠিক।"

পরের দিনই খবরের কাগজে শিক্ষকদের জন্যে বিজ্ঞাপন দেয়া হল। এক সপ্তাহের মাঝে আবেদনপত্র জমা হতে শুরু করল এবং ফরাসত আলি আর ফারুখ বখত তাদের ইন্টারভিউ নিতে শুরু করলেন। ব্যাপারটি যত সহজ হবে বলে ধারণা করা হয়েছিল মোটেই তত সহজ হল না। যেমন ধরা যাক কম্পিউটারের শিক্ষকের কথা। প্রথমে যে এল তার চোখে কালো চশমা এবং মুখে সিগারেট। ফারুখ বখত বললেন, "আমাদের এটা বাচ্চাদের স্কুল, সিগারেট খাওয়া একেবারে বন্ধ করার চেষ্টা করছি।"

কালো চশমা চোখের মানুষটি সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বলল, "এটা বিদেশী সিগারেট। আমি দেশী সিগারেট খাই না।"

"দেশী-বিদেশী জানি না, আমাদের স্কুল কম্পাউন্ডে সিগারেট খাওয়া নিষিদ্ধ।"

শুনে লোকটা হো হো করে হেসে উঠল যেন তিনি খুব একটা মজার কথা বলেছেন। ফারুখ বখত তখন তাঁর ইন্টারভিউয়ের খাতায় লোকটির নামের পাশে কাটা চিহ্ন দিয়ে লিখলেন 'বাতিল'।

পরের মানুষটির মুখে একধরনের সবজান্তা সবজান্তা ভাব। ফারুখ বখত আর ফরাসত আলির হাত ধরে খুব জোরে কয়েকবার ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "স্কুলের বাচ্চাদের কম্পিউটার শেখানোটা খুব ভালো আইডিয়া।"

ফরাসত আলি উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কম্পিউটার বিষয়ে অভিজ্ঞ?"

"বলতে পারেন। আমার বন্ধুর ছোটভাইয়ের একটা কম্পিউটার আছে, আমি কয়েকবার দেখেছি।"

"দেখেছেন?"

"হ্যাঁ।"

"কখনো ব্যবহার করেননি?"

"আপনাদের স্কুলে জয়েন করেই ব্যবহার করব।"

ফারুখ বখত মাথা নেড়ে বললেন, "বাচ্চা ছেলেদের কম্পিউটার ব্যবহার করা শেখাতে হবে, প্রোগ্রামিং করা শেখাতে হবে, আপনি কেমন করে সেটা করবেন?"

সবজান্তা চেহারার মানুষটা একটু অধৈর্য হয়ে বলল, "আপনারা ঠিক বুঝতে পারছেন না! আমি উপমন্ত্রীর ছোটভাইয়ের সাক্ষাৎ শালা—"

ফারুখ বখত সবজান্তা মানুষটাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "আমরা তো শালা-সম্বন্ধীকে খুঁজছি না, কম্পিউটারের একজন মাস্টার খুঁজছি। আপনি এখন আসেন—"

তারপর তিনি তার ইন্টারভিউয়ের খাতায় সবজান্তার নামের পাশে বড় করে লিখলেন 'বাতিল'।

এর পরের যে-মানুষটি এল সে একেবারে সাদাসিধে চেহারার। ফারুখ বখত জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কি কম্পিউটার সম্পর্কে জানেন শোনেন?"

"কম্পিউটার?" লোকটা খুব অবাক হয়ে ফারুখ বখতের দিকে তাকাল।

"হ্যাঁ, কম্পিউটার।" ফারুখ বখত আরও অবাক হয়ে সাদাসিধে লোকটার দিকে তাকালেন।

সাদাসিধে লোকটা মাথা চুলকে বলল, "কম্পিউটার কী সেটা তো আমি জানি না। আমি ভাবছিলাম আপনারা জিরক্স করার কপি মেশিনের কথা বলছিলেন। সেটা আমি খুব ভালো করে জানি। উপরে কাগজটা দিয়ে ডানদিকে টিপি দিতে হয়। তখন কাগজটা কপি হয়ে বের হয়ে আসে।"

ফারুখ বখত হাসি চেপে বললেন, "কিন্তু আমরা তো জিরক্স করার কপি মেশিনের জন্যে মানুষ খুঁজছি না, আমরা খুঁজছি কম্পিউটারের মাস্টার।"

তারপর তার নামের পাশে ছোট ছোট করে লিখলেন, 'বাতিল'।

এইভাবে একজনের পর আরেকজন বাতিল হয়ে শেষ পর্যন্ত যে-মানুষটিকে নেয়া হল তার নাম মুহম্মদ মহসিন। তার বয়স বেশি না, দেখে মনে হয় বুঝি স্কুলের ছাত্র। সে কলেজে পড়তে পড়তে পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে বাজারের কাছে কম্পিউটারের একটা দোকানে বসে কাজ শুরু করেছিল। কয়েকদিনের মাঝে আবিষ্কার করল কম্পিউটার কেমন করে ব্যবহার করতে হয় ব্যাপারটা সে খুব ভালো বোঝে। কম্পিউটারের দোকানের মালিকের সাথে তার কী-একটা গোলমাল হওয়ার পর সে চাকরি ছেড়ে চলে এসেছে। কম্পিউটারগুলিতে সে কী করে এসেছে কেউ জানে না, কিন্তু প্রতি বুধবার বেলা এগারোটার সময় কম্পিউটারগুলি হঠাৎ মোটা গলায় সুর করে বলে—

জব্বার ভাই
চামড়া দিয়া জুতা বানাই

দোকানের মালিক জব্বার আলি ব্যাপারটা একেবারেই পছন্দ করেন না। তিনি বুধবার বেলা এগারোটার সময় তাঁর দোকান একঘন্টার জন্যে বন্ধ করে দেন। শোনা যাচ্ছে তিনি তাঁর কম্পিউটারগুলি বিক্রি করে দেয়ার চেষ্টা করছেন, কিন্তু সুবিধা করতে পারছেন না!

ফরাসত আলি এবং ফারুখ বখতের মহসিনকে খুব পছন্দ হল। তখন-তখনই তাকে তাঁরা একটা চেক লিখে পথচারী স্কুলের কম্পিউটারের সব দায়িত্ব দিয়ে দিলেন।

কম্পিউটারের শিক্ষকের পর তাঁরা খেলাধুলার জন্যে একজন শিক্ষক খোঁজাখুঁজি করতে লাগলেন। ইন্টারভিউ দিতে প্রথম যে-মানুষটি এসে হাজির হল তাকে দেখে তাদের চোখ কপালে উঠে গেল। মানুষটি শুকনো হাড়জিরজিরে, গাল ভেঙে মুখের ভিতরে ঢুকে গেছে, চোখ গর্তের ভিতরে। মানুষটির গায়ের চামড়া এবং দাঁত হলুদ রঙের। ঘরে ঢুকে চেয়ারে বসে মানুষটি কাশতে শুরু করল, ফরাসত আলি আর ফারুখ বখতের মনে হতে লাগল কাশতে কাশতে এই চেয়ারেই মানুষটি দম আটকে পড়ে যাবে এবং এক্ষুনি স্ট্রেচারে করে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। মানুষটি শেষ পর্যন্ত নিজেকে সামলে নিল, তখন ফারুখ বখত ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কোন পোস্টে ইন্টারভিউ দিতে এসেছেন?"

"কেন, খেলাধুলার শিক্ষক!"

"কিন্তু খেলাধুলার শিক্ষকদের অনেক শক্তসমর্থ হওয়া দরকার। দৌড়াদৌড়ি করতে হবে, পি. টি. স্পোর্টস, সাঁতার ফুটবল ক্রিকেট, আপনি কি পারবেন এইসব?"

মানুষটি কথা বলতে গিয়ে আবার কাশতে শুরু করল এবং কাশি শেষ হবার আগেই তার হাঁপানির টান শুরু হয়ে গেল। ফারুখ বখত আর ফরাসত আলি দীর্ঘ সময় চুপ করে বসে রইলেন এবং মানুষটি শেষ পর্যন্ত নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, "বছরের এই সময়টা আমি মোটামুটি ভালো থাকি, এই সময়ে কোনো অসুবিধে নেই। কিন্তু—"

ফারুখ বখত ইন্টারভিউয়ের খাতায় মানুষটির নামের পাশে বড় বড় করে লিখলেন, 'বাতিল'।

এর পরে যে-মানুষটি এসে ঢুকল তাকে একটা ছোটখাটো দৈত্য বলে চালিয়ে দেয়া যায়, ঘরে ঢোকার সময় তার দরজায় মাথা ঠুকে গেল। তার বুকের সিনা দুই মিটারের এক সেন্টিমিটার কম না। হাতের মাংসপেশি দেখে মনে হয় বুঝি জীবন্ত কোনো প্রাণী কিলবিল করছে। ফারুখ বখত এবং ফরাসত আলি দুজনেই তাকে দেখে অভিভূত হয়ে গেলেন।

মিনি দৈত্যটি তাদের সামনে চেয়ারে বসার পর ফরাসত আলি বললেন, "আপনি নিশ্চয়ই খেলাধুলায় শিক্ষকের জন্যে ইন্টারভিউ দিতে এসেছেন?"

"হাঁহ?"

ফরাসত আলি আবার প্রশ্নটি করলেন এবং মিনি দৈত্যকে খুব বিভ্রান্ত দেখা গেল। ফরাসত আলি খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে আবার প্রশ্ন করলেন। এবারে মিনি দৈত্য সম্মতির ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলল, "হাঁহ।"

ফারুখ বখত তাঁর বলপয়েন্ট কলমটা টেবিলে ঠুকতে ঠুকতে বললেন, "ছোট বাচ্চাদের নিয়ে খেলাধুলা করার ব্যাপারে আপনার কোনো অভিজ্ঞতা আছে?"

"হাঁহ?"

ফারুখ বখত আবার প্রশ্নটি করলেন এবং মিনি দৈত্য আবার বলল, "হাঁহ?"

ফরাসত আলি অনেকক্ষণ চিন্তা করে এবারে জিজ্ঞেস করলেন, "ফুটবল ক্রিকেট ভলিবল এইসব খেলা আপনি জানেন?"

"হাঁহ?"

এতক্ষণে তাঁরা দুইজনে বুঝে গেছেন এই বিশাল মানুষের শক্তিশালী দেহটির নিয়ন্ত্রণে যে-মস্তিষ্কটি আছে সেটি আকারে খুবই ছোট, লবণের চামচে দুই চামচের বেশি হবার কথা নয়। ছোট বাচ্চাদের খেলাধুলার দায়িত্বে এই মানুষটিকে রাখার কোনো প্রশ্নই আসে না। ফারুখ বখত তার নামের পাশে বড় বড় করে লিখলেন, 'বাতিল'।

এরপর যে-মানুষটি ইন্টারভিউ দিতে এল সে খুব লম্বা নয় কিন্তু তার পেটা শরীর। মানুষটি শার্টের হাতা গুটিয়ে তাদের সামনে বসে দাঁত বের করে হেসে বলল, "কেমুন আছেন ওস্তাদ?"

ফারুখ বখত আর ফরাসত আলিকে এর আগে কেউ ওস্তাদ বলে ডাকেনি তাই তাঁরা একজন আরেকজনের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "ভালো।"

ফরাসত আলি তার কাগজপত্র দেখে জিজ্ঞেস করলেন, "খেলাধুলার ব্যাপারে আপনার অভিজ্ঞতা আছে?"

"কী বুলেন আপনি! জেইলখানায় আমার কাবাডি টিম ছিল চ্যাম্পিয়ান।"

ফারুখ বখত আর ফরাসত আলি দুজন একসাথে চমকে উঠে বললেন, "জেলখানায়?"

"হুঁ হুঁ।"

"জেলখানায় আপনি কী করতেন?"

"জেইলখানায় কী করে মানুষে? কয়েদ খাটে। হা হা হা!"

"কেন গিয়েছিলেন আপনি জেলে?"

"মার্ডার কেস।"

"মার্ডার কেস?"

মানুষটি পিচিক করে মেঝেতে থুতু ফেলে বলল, "খামাখা কোর্ট কাচারী! জজ সাহেবের লাশ ফেলে দেয়া দরকার ছেল—"

ফরাসত আলি ঢোক গিলে বললেন, "আপনি জজ সাহেবকে খুন করার কথা বলছেন?"

লোকটা মনে হল একটু অসন্তুষ্ট হয়ে বলল, "এত অবাক হচ্ছেন কেন? খুন-খারাপি করেন নাই কুনোদিন?"

ফরাসত আলি আর ফারুখ বখত কোনোদিন খুন-খারাপি করেননি শুনে লোকটা খুব অবাক এবং হতাশ হল। মেঝেতে পিচিক করে আরেকবার থুতু ফেলে বলল, "যার যেইটা লাইন—"

ফারুখ বখত সাবধানে এই মানুষটির নামের পাশে বড় বড় করে লিখলেন, 'বাতিল'!

খেলাধুলার শিক্ষক হিসেবে শেষ পর্যন্ত যাকে নেয়া হল সে কমবয়সী একটা মেয়ে। মেয়েটি হালকা পাতলা, চেহারার মাঝে একটা উদাস-উদাস ভাব। কথা-বার্তা খুব সুন্দর করে বলে শুনলে মনে হয় কেউ বুঝি টেলিভিশনে খবর পড়ছে! মেয়েটিকে দেখে ফারুখ বখত আর ফরাসত আলি মনে-মনে তাকে বাতিল বলে ধরে নিয়েছিলেন, তাদের ধারণা ছিল খেলাধুলার শিক্ষক হতে হবে গাট্টাগোট্টা একজন পুরুষ। যখন কথাবার্তা শুরু হল ফারুখ বখত বললেন, "খেলাধুলার ব্যাপার, বুঝতেই পারছেন ছোটাছুটি দৌড়াদৌড়ি করতে হয়, মেয়েদের—"

কমবয়েসী মেয়েটি— যার নাম রুখসানা হক, মিষ্টি করে হেসে বলল, "আপনি ভাবছেন মেয়েরা ছেলেদের মতো দৌড়াদৌড়ি ছোটাছুটি করতে পারে না?"

ফারুখ বখত থতমত খেয়ে বললেন, "না, ঠিক তা বলছি না।"

মেয়েটি আবার মিষ্টি করে হেসে বলল, "আপনারা এক সেকেন্ড টেবিল থেকে সরে বসবেন?"

ফারুখ বখত আর ফরাসত আলি ঠিক কী হচ্ছে বুঝতে না পারলেও টেবিল থেকে সরে দাঁড়ালেন। রুখসানা শাড়িটা কোমরে পেঁচিয়ে দুইপা পিছিয়ে গেল। ডানহাতটা উপরে তুলে বামহাতটা সে নিজের সামনে ধরে দাঁড়াল। তারপর কিছু বোঝার আগেই হঠাৎ সে গুলির মতো ছুটে আসে, ডানহাত দিয়ে টেবিলের মাঝখানে আঘাত করল আর সাথে সাথে টেবিলটা দুভাগ হয়ে মেঝেতে পড়ে গেল। রুখসানা হাত ঝেড়ে শাড়িটা আবার ঠিক করে পরে ফারুখ বখতের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হেসে বলল, "সস্তা কাঠ! পাটশলার মতো ভেঙে যায়।"

ফারুখ বখত আর ফরাসত আলি মিনিটখানেক কথা বলতে পারলেন না। তারপর বললেন, "তুমি—মানে—আপনি, মানে—হাত দিয়ে—মানে তুমি—"

রুখসানা বলল, "থার্ড ডিগ্রী ব্ল্যাক বেল্ট। বড় কথা হচ্ছে ব্যালেন্স, শরীরের উপর ব্যালেন্স রাখতে হয়। জোরটা দিতে হয় ঠিক যেখানে প্রয়োজন। ছেলে মেয়ে বলে কোন কথা নেই। ছেলেরা যেটা পারে মেয়েরাও সেটা পারে।"

"অবশ্যি অবশ্যি।"

"তাই খেলাধুলার শিক্ষক হতে হলে ছেলে হতে হবে সেরকম কোন কথা নেই।"

রুখসানা তার ব্যাগ হাতে নিয়ে বলল, "ঠিক আছে আসি তাহলে।"

ফারুখ বখত বললেন, "কো-কো-কোথায় যাচ্ছেন?"

"চলে যাচ্ছি। আপনাদের কথাবার্তা শুনে বুঝে গেছি আপনারা মেয়েদের ক্ষমতায় বিশ্বাস করেন না। শুধু সময় নষ্ট করে কি হবে?"

রুখসানা চলে যেতে যেতে দরজার কাছে থেমে বলল, "টেবিলটার জন্যে দুঃখিত। আপনারা তো লটারীতে অনেক টাকা পেয়েছেন, আরেকটা কিনে নেবেন!"

ফারুক বখত আর ফরাসত আলি কিছু বলার আগে দরজা খুলে রুখসানা বের হয়ে গেল।

সেকেন্ড দশেক পরে হঠাৎ ফারুখ বখত আর ফরাসত আলি ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন। তারপর দুজনে দুদ্দাড় করে ছুটতে ছুটতে রুখসানাকে রাস্তায় গিয়ে ধরলেন। একেবারে হাতজোড় করে বললেন, "প্লিজ রুখসানা প্লিজ, তুমি যেয়ো না!"

ফরাসত আলি বললেন, "তোমার মতো একজন দরকার আমাদের স্কুলে।"

ফারুখ বখত বললেন, "আমাদের স্কুলের ছেলেমেয়েদের খেলাধুলার ভারটা তুমি নাও!"

"যেভাবে তুমি করতে চাও, যা তুমি করতে চাও!"

"তুমি বলো তোমার কী লাগবে। এই মুহূর্তে তোমাকে চেক লিখে দেব।"

রুখসানা মিষ্টি করে হেসে বলল, "আপনারা এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন, আপনারা যদি চান অবশ্যি আমি খেলাধুলার শিক্ষক হব! ছোট ছেলেমেয়েদের আমার খুব ভালো লাগে।"

কম্পিউটার আর খেলাধুলার শিক্ষক ছাড়াও তাঁদের একজন অঙ্ক আরেকজন বিজ্ঞানের শিক্ষক দরকার ছিল। অঙ্কের শিক্ষকটি তাঁরা পেয়ে গেলেন খুব সহজে। বিশ্ববিদ্যালয়ের রিটায়ার্ড অঙ্কের প্রফেসর, নাম ইদরিস আলি, সবাই ডাকে প্রফেসর আলি। ঘোর নাস্তিক মানুষ, অঙ্ক কষে প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন ঈশ্বর বলে কিছু নেই। পুরো ব্যাপারটা নাকি শেষ পর্যন্ত একটা দ্বিমাত্রিক ইকুয়েশানে এসে শেষ হয়েছে। সেই ইকুয়েশানের দুইটি সম্ভাব্য উত্তর। একটি উত্তর সত্যি হলে ঈশ্বর আছে, আরেকটি সত্যি হলে ঈশ্বর নেই। এখন কোনটি সত্যি সেটা নিয়ে খুব সমস্যার মাঝে আছেন। পথচারী স্কুলের বাচ্চাদের অঙ্ক

শেখানোর জন্যে অবিশ্যি সেটি কোনো সমস্যা নয়। কারণ ফরাসত আলি আর ফারুখ বখত বারবার করে বলে দিয়েছেন এই স্কুলের বাচ্চারা হবে নতুন যুগের মানুষ, তার অর্থ নিজের ধর্মকে ভালোবাসবে এবং অন্যের ধর্মকে শ্রদ্ধা করবে। কাজেই ঈশ্বর আছে কি নেই এ-ধরনের গুরুতর বিষয় নিয়ে তাদের যেন বিভ্রান্ত করে দেয়া না হয়। প্রফেসর আলি খানিকক্ষণ তর্ক করে শেষ পর্যন্ত রাজি হয়েছেন— তিনি তর্ক করতে ভালোবাসেন, প্রতিদিন ভোরে নাস্তা করার আগে কেন নাস্তা করতে হবে সেটা নিয়েও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে প্রায় আধঘণ্টা তর্ক করেন। প্রফেসর আলি বলেছিলেন পথচারী স্কুলে বাচ্চাদের পড়ানোর জন্যে তিনি কোনো বেতন নেবেন না, কিন্তু ফারুখ বখত আর ফরাসত আলি বলেছেন, বেতন না নিলে কেউ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করে না। তিনি শেষ পর্যন্ত অল্প কিছু বেতন নিতে রাজি হয়েছেন।

অঙ্কের শিক্ষক সহজে পেয়ে গেলেও বিজ্ঞানের শিক্ষক পাওয়া খুব সহজ হল না। অনেকেই ইন্টারভিউ দিতে এসেছিল কিন্তু কাউকেই ফারুখ বখত আর ফরাসত আলির পছন্দ হয় না। তাঁরা হারুন ইঞ্জিনিয়ারকে অনেকবার অনুরোধ করলেন কিন্তু হারুন ইঞ্জিনিয়ার কিছুতেই রাজি হলেন না, ছোট বাচ্চাদের তিনি খুব ভয় পান, তাদের থেকে তিনি সবসময় অন্তত একশো হাত দূরে থাকতে চান! তিনি স্কুলঘরটা সোজা করে বসিয়েই চলে যাবেন, তাঁর নাকি ইতালি বা আমেরিকা কোথায় গিয়ে বছরখানেক কাজ করতে হবে। বিজ্ঞানের শিক্ষক হিসেবে যাঁকে শেষ পর্যন্ত নেয়া হল তাঁর নাম রাণু মুখার্জী, সবাই তাঁকে রাণুদিদি বলে ডাকে। তিনি স্কুল কলেজ পাশ করেছেন অনেক আগে কিন্তু কখনো কোথাও কাজ করেননি, নিজের বাচ্চাদের মানুষ করেছেন। বাচ্চারা এখন কলেজে পড়ে তাই নিজের অনেক অবসর। এলাকার সবাই জানে তিনি খুব কাজের মানুষ, সবসময় কিছু-না-কিছু করছেন। তাঁর বাসায় ফুলের টবে নানারকম শবজি গাছ লাগানো। বিচিত্র সব শবজি, শসা এবং কুমড়া একত্র করে তৈরি হয়েছে শমড়া, জিনিসটা দেখতে কুমড়ার মতো বড় কিন্তু খেতে শসার মতো। টমেটো আর বেগুন দিয়ে তৈরি হয়েছে টমেগুন যেটা দেখতে খানিকটা বেগুনের মতো আবার খানিকটা টমেটোর মত। সেটা ব্যবহার করে বেগুনের টক রান্না করার সময় আলাদা করে আর টক দিতে হয় না, কারণ টমেগুণ খেতে টক বেগুনের মতো। রাণুদিদির আরও নানাধরনের আবিষ্কার রয়েছে, সূর্যের আলো ব্যবহার করে পানি গরম করা কিংবা রান্না করা তার মাঝে একটা। বাসার ছাদে একটা বিরাট অ্যালুমিনিয়ামের ডেকচি ঝুলিয়ে একবার উপগ্রহ থেকে কিছু সিগন্যাল ধরেছিলেন। তিনি এখন বাসার নিচে অনেকগুলি ক্যাপাসিটর জড়ো করেছেন, বজ্রপাতের সময় সেই ক্যাপাসিটর চার্জ করে সেটা ব্যবহার করার চেষ্টা করছেন। ফারুখ বখত আর ফরাসত আলি বিজ্ঞানের জন্যে ভালো কোনো শিক্ষক না পেয়ে শেষ পর্যন্ত রাণুদিদির শরণাপন্ন হয়েছেন। প্রথমে রাজি হননি কিন্তু পথচারী স্কুলের কর্মকাণ্ড শুনে শেষ পর্যন্ত ঠিক করলেন কয়েকদিন কাজ করে দেখবেন।

স্কুলের জন্যে একজন ডাক্তার খুঁজে পেতে খুব অসুবিধে হল। যে-ডাক্তারের কাছেই যান সে-ই বলে, আপনাদের উদ্দেশ্য খুব মহৎ, কিন্তু এর জন্যে তো ডাক্তারের দরকার নেই। সব সুস্থ-সবল ছেলে। ডাক্তারের তো কোনো কাজ থাকবে না, বসে থেকে থেকে বিরক্ত হয়ে যাবে!

ফরাসত আলি বললেন, "কিন্তু যদি অসুখ করে?"

"তখন যাবে ডাক্তারের কাছে।"

"যদি চেকআপ করাতে হয়?"

"তখন আসবে একজন ডাক্তার।"

"যদি হঠাৎ করে কোনো অ্যাকসিডেন্ট হয়?"

ডাক্তারেরা মাথা চুলকে বলেন, "এমনভাবে স্কুলঘরটা তৈরি করবেন যেন কোনো অ্যাকসিডেন্ট না হয়। যদি তবু কিছু ঘটে যায় ইমার্জেন্সিতে নিয়ে যাবেন।"

ফারুখ বখত মনমরা হয়ে বললেন, "ভাবছিলাম স্কুলে সবসময় ডাক্তার থাকবে—"

ডাক্তারেরা মাথা নেড়ে বলেন, "কিছু দরকার নেই! একজন নার্স থাকলেই যথেষ্ট। বিলাত আমেরিকার স্কুলেও ডাক্তার থাকে না, শুধু একজন নার্স থাকে।"

শেষ পর্যন্ত তা-ই ঠিক হল, স্কুলে শুধু একজন নার্স থাকবে। খুঁজে-পেতে একজন নার্স পাওয়া গেল, ভদ্রমহিলা স্থানীয় খ্রিষ্টান, নাম মার্থা রোজারিও। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, হাসিখুশি মহিলা, বাংলায় একটু উত্তরবঙ্গের টান রয়েছে। মাঝে মাঝে 'আমার' বলতে গিয়ে 'হামার' বলে ফেলেন। দীর্ঘদিন নানা হাসপাতালে কাজ করেছেন, প্রচুর অভিজ্ঞতা, সত্যিকারের ডাক্তার না থাকলেও কোনো অসুবিধে হবার কথা নয়। তা ছাড়া রাগী-রাগী চেহারার একজন ডাক্তার থেকে হাসিখুশি একজন মহিলা ছোট ছোট বাচ্চাদের জন্যে ভালো।

স্কুলের কর্মচারীদের মাঝে যাকে সবচেয়ে সহজে পাওয়া গেল সে হচ্ছে বাচ্চাদের খাবার রান্না করার জন্য একজন বাবুর্চি। তার নাম চুন্নু মিয়া। সে স্কুল তৈরি করার সময় হারুন ইঞ্জিনিয়ারের ডান হাত ছিল। খুব কাজের মানুষ, এমন কোনো কাজ নেই যেটা করতে পারে না। স্কুলের নানারকম কাজকর্মে সে আগে থেকেই লেগে ছিল, বাবুর্চির দরকার শুনে নিজেকে দাখিল করে দিল। তার বাবা এবং দাদা নাকি মুন্সিগঞ্জ এলাকার বিখ্যাত বাবুর্চি। সে নিজেও বিয়ে জন্মদিন বা বউভাত উপলক্ষে রান্না করতে যায়। শহরের কোনো কোনো অঞ্চলে তাকে লোকজন 'ওস্তাদ চুন্নু মিয়া' বলে ডাকে।

ফারুখ বখত চুন্নু মিয়ার আবেদন শুনে বললেন, "এটা কিন্তু বাচ্চাদের স্কুল। এদের জন্যে কিন্তু কাচ্চি বিরিয়ানি রাঁধতে হবে না।"

চুন্নু মিয়া বলল, "কোনো অসুবিধা নাই। আমি ঢাকা শহরে সাহেবমেমদের বাসাতে কাজ করেছি, চপ-কাটলেটও তৈরি করতে পারি।"

ফরাসত আলি মাথা নাড়লেন, "উহুঁ। সাহেবি খাওয়া চলবে না।"

"কোনো সমস্যা নাই। দেশী খাবারও রাঁধতে পারি। শিঙাড়া সমুচা নিমকি—"

ফরুখ বখত বাধা দিয়ে বললেন, "না না, শিঙাড়া সমুচা ভাজাভুজি চলবে না। আটার রুটি আর শবজি। সাথে ফলমূল আর কাঁচা শবজির সালাদ। সঙ্গে গোরুর দুধ এক গ্লাস।"

চুন্নু মিয়া খানিকক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে বলল, "আটার রুটি বানানোর জন্যে বাবুর্চি লাগে?"

ফারুখ বখত মাথা নেড়ে বললেন, "লাগে। করতে পারলে বলো তোমাকে অ্যাপয়ন্টমেন্ট লেটার দিয়ে দেব।"

"পারব স্যার। কোনো অসুবিধা নাই।"

সাথে সাথে চুন্নু মিয়ার চাকরি হয়ে গেল। সকালে দারোয়ান, স্কুল চলার সময় দপ্তরি, দুপুরবেলায় বাবুর্চি।

কয়েকদিনের মাঝেই সব কয়জন শিক্ষক নিয়ে স্কুলের কাজ শুরু হল। যেহেতু স্কুলঘরটা এখনও আড়াআড়িভাবে দাঁড়িয়ে আছে, বিভিন্ন ক্লাসঘরে যাবার জন্যে কিছু মই

লাগানো হয়েছে। শিক্ষকেরা মই দিয়ে উপরে-নিচে যাতায়াত করেন, ছাত্রদের মই লাগে না, এমনিতেই দেয়াল খামচে খামচে ক্লাসে উঠে যায়। কোন বয়সী বাচ্চাকে কী পড়ানো হবে মোটামুটি ঠিক করা হয়েছে, সবাই খুব উৎসাহ নিয়ে কাজ করছে। স্কুলটা মোটামুটি দাঁড়িয়ে যাবে বলে মনে হচ্ছে। ফরাসত আলি এবং ফারুখ বখত প্রায় রোজই এসে দেখে যান, তাঁদের নিজেদের স্কুলে বাচ্চারা পড়াশোনা করছে, দুপুরে নাস্তা করছে, বিকেলে মাঠে খেলছে দেখে তাঁদের বুক দশহাত ফুলে যায়।

স্কুলে বাংলা ইংরেজি পড়াতেন মীর্জা মাস্টার, কয়দিন দেখে ফরাসত আলিও বাচ্চাদের ইংরেজি পড়ানো শুরু করেছেন। তাঁকে দেখে ফারুখ বখতও একটু সাহস পেয়েছেন, বাচ্চাদের জন্যে তাই পৌরনীতির একটা ক্লাস খোলা হয়েছে। ফারুখ বখত রাত জেগে পড়াশোনা করে দিনের বেলা ক্লাস নিচ্ছেন, বিষয়বস্তুটির জন্যেই কি না জানা নেই তাঁর ক্লাসে ছাত্রদের খুব বেশি মনোযোগ নেই।

দেখতে দেখতে বেশ গরম পড়ে গেছে, দিনরাত ফরাসত আলির চুল-দাড়ি কুটকুট করে। প্রতি বছর অনেক আগেই তিনি সব কেটেকুটে ফেলেন, এ-বছর অনেক দেরি হয়ে গেছে। আর না পেরে একরাতে তিনি তাঁর নাপিতের দোকানে গিয়ে চুল-দাড়ি কামিয়ে পুরোপুরি মুসোলিনি হয়ে ফিরে এলেন। এই ব্যাপারটি নিয়ে আগে কখনো কোনো সমস্যা হয়নি, কিন্তু এবারে গুরুতর সমস্যা হয়ে গেল।

পরদিন ফরাসত আলি স্কুলে গিয়েছেন। ছাত্রছাত্রীরা আসতে শুরু করেছে, আগে তাঁকে দেখে সবাই একটা সালাম ঠুকে দিত, কিন্তু আজকে সালাম ঠোকা দূরে থাকুক এমনভাবে তাঁর দিকে তাকাতে লাগল যেন তিনি খুব অন্যায় কাজ করে ফেলেছেন! তিনি যখন স্কুলের নতুন কম্পিউটার-ঘরটা দেখতে গেলেন হঠাৎ একটা বিচিত্র ব্যাপার ঘটল। স্কুলের কম্পিউটার-শিক্ষক মহসিন কমিউটার-ঘরে ঢুকে ফরাসত আলিকে দেখে চমকে উঠল। কাছে এসে গলা উঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কে? এখানে কী করছেন?"

ফরাসত আলি বুঝতে পারলেন দাড়ি-গোঁফ-চুল সব কামিয়ে ফেলেছেন বলে মহসিন তাঁকে চিনতে পারছে না। একগাল হেসে বললেন, "আমি ফরা—"

"পড়া?" মহসিন মাঝপথে থামিয়ে বলল, "আপনি পড়াশোনা করতে এসেছেন? দেখছেন না এটা বাচ্চাদের স্কুল! শুধু বাচ্চারা পড়াশোনা করছে। আপনি পড়তে চাইলে কলেজ যাবেন, ইউনিভার্সিটি যাবেন।"

ফরাসত আলি মাথা নেড়ে বললেন, "না না, আমি ফরাসত—"

"ফরাসত আলি সাহেবের সাথে দেখা করতে চাইলে এখানে এসেছেন কেন? এটা কম্পিউটার-ঘর। এখানে বাচ্চাকাচ্চারা কম্পিউটার ব্যবহার শিখে—"

"না না, আমি ফরাসত আলির সাথে দেখা করতে চাই না। আমি—"

"তা হলে আপনি এখানে কী করছেন? নিচে যান। স্কুল চলার সময় বাইরে থেকে লোকজন এলে স্কুলে পড়াশোনার ক্ষতি হয়। যদি স্কুলটা দেখতেই চান অ্যাপয়ন্টমেন্ট করে আসবেন।"

ফরাসত আলি আবার কী একটা বলতে যাচ্ছিলেন মহসিন শুনল না, তাঁকে ঠেলে বের করে দিয়ে উপর থেকে চিৎকার করে চুন্নু মিয়াকে ডেকে বলল, "চুন্নু মিয়া, এই লোকটিকে এখান থেকে নিয়ে যাও। কম্পিউটার-ঘরে ঘুরঘুর করছে।"

মহসিনের কথা শেষ হবার আগেই চুন্নু মিয়া দুই লাফে উপরে উঠে ফরাসত আলির হাত ধরে হিড়হিড় করে নিচে নামিয়ে নিল। বলল, "স্কুল চলার সময় এখানে বাইরের মানুষের কারফিউ। কেন এসেছেন আপনি?"

ফরাসত আলি আস্তে আস্তে রেগে উঠছিলেন, গলা উঁচিয়ে বললেন, "চুন্নু মিয়া—"

চুন্নু মিয়া তখন আরও রেগে গেল, চিৎকার করে বলল, "এত বড় সাহস আমার সাথে গলাবাজি! আমাকে চেনেন না আপনি? ফরাসত স্যার নিজে আমাকে বলেছেন স্কুল কম্পাউন্ডের মাঝে যেন একটা মাছি ঢুকতে না পারে, আর আপনি এত বড় একটা মানুষ ঢুকে গেছেন? কত বড় সাহস—"

ফরাসত আলি তখন আরেকটু রেগে গেলেন, বললেন, "মুখ সামলে কথা বলো চুন্নু মিয়া—"

"কেন? আপনাকে ভয় পাই নাকি আমি? কম্পিউটার-ঘরে ঘুরঘুর করছেন, লাখ লাখ টাকার কম্পিউটার সেখানে, আপনার মতলব আমরা বুঝি না মনে করছেন? আপনাকে পুলিশে দেয়া দরকার—"

"পুলিশে? তোমার এত বড় সাহস! তুমি আমাকে পুলিশে দেবে?"

চুন্নু মিয়া মুখ শক্ত করে বলল, "আমার কথা বিশ্বাস হল না? ঠিক আছে এই দেখেন—"

কিছু বোঝার আগে ফরাসত আলি আবিষ্কার করলেন চুন্নু মিয়া তাঁকে দুজন পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে এবং তারা কম্পিউটার-ঘরে সন্দেহজনক কার্যকলাপের জন্যে তাঁকে ধরে হাজতে পুরে ফেলেছে। ফরাসত আলি কয়েকবার পরিচয় দেবার চেষ্টা করলেন কিন্তু কোনো লাভ হল না। বলা যেতে পারে হঠাৎ করে ফরাসত আলির মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল।

এদিকে স্কুলে ফারুখ বখত বারবার পায়চারি করছেন। সকালবেলা ফরাসত আলি একটা ইংরেজি ক্লাস নেন, তাঁর এখনও কোনো দেখা নেই। ক্লাসে শিক্ষক আসছে না ছাত্রদের জন্যে সেটা খুব খারাপ উদাহরণ—ফারুখ বখত অনেক ভেবেচিন্তে মহসিনকে ডেকে পাঠালেন। মহসিন তার কম্পিউটার-ঘরে তালা মেরে ফারুখ বখতের কাছে হাজির হল। ফারুখ বখত মহসিনকে বললেন, "মহসিন, ফরাসত আলি আসে নি, আজকে তোমাকে ইংরেজি ক্লাসটা নিতে হবে।

মহসিন মাথা চুলকে বলল, "আমি?

"হ্যাঁ। কোনো উপায় নেই, তাড়াতাড়ি যাও।"

"কিন্তু আমি কখনো ইংরেজী ক্লাস নিইনি।"

"তাতে কী আছে? তাড়তাড়ি যাও।"

মহসিন চিন্তিত মুখে ক্লাসে হাজির হল। ছাত্রছাত্রীরা তাকে দেখে আনন্দে চিৎকার করে ওঠে, "কম্পিউটার স্যার, কম্পিউটার স্যার!!"

মহসিন মাথা নেড়ে বলল, "কিন্তু এখন আমি তোমাদের ইংরেজি পড়াব।"

ছাত্রছাত্রীরা আনন্দে চিৎকার করে উঠল, "ইংরেজি ইংরেজি!!"

মহসিন বলল, "এখন বলো দেখি মাইক্রো-প্রসেসর কেমন করে বানান করে? হার্ড ড্রাইভ? র‍্যান্ডম এক্সেস মেমোরি?"

ছাত্রছাত্রীরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে থাকে। মহসিন হাসিমুখে বলল, "খুব সোজা, একেবারে পানির মতো সোজা। এম-আই-সি...."

একদিন ফারুখ বখত আবিষ্কার করলেন মহসিনকে ইংরেজি পড়াতে পাঠানো ঠিক হয়নি, এক্ষুনি অন্য একটা ক্লাসে কম্পিউটার শেখানোর কথা। তারা দল বেঁধে হাজির হয়ে গেছে, কী করবেন বুঝতে না পেরে তাড়াতাড়ি অঙ্কের শিক্ষক প্রফেসর আলীকে ডেকে

পাঠালেন। প্রফেসর আলি তাঁর বইপত্র নিয়ে হাজির হলেন, ফারুখ বখত মাথা চুলকে বললেন, "একটা সমস্যা হয়ে গেছে।"

"কী সমস্যা?"

"কম্পিউটারের ক্লাস, কিন্তু মহসিনকে পাঠিয়েছি ইংরেজি ক্লাস নেয়ার জন্যে। এখন কম্পিউটারের ক্লাস নেবার কেউ নেই।"

প্রফেসর আলি তর্ক করতে ভালোবাসেন, মুখ ছুঁচালো করে বললেন, "কেন পাঠালে মহসিনকে?"

"আর কেউ ছিল না আশেপাশে। এখন আপনাকে একটু কম্পিউটারের ক্লাসটা নিতে হবে।" ফারুখ বখত মুখ কাঁচুমাচু করে বললেন, "খোদার কসম!"

"খোদা বা ঈশ্বর বলে কিছু নেই!" ঘোর নাস্তিক প্রফেসর আলি মুখ শক্ত করে বললেন, "যার অস্তিত্ব নেই তার কসমে আমি বিশ্বাস করি না।"

"আচ্ছা ঠিক আছে, পাউরুটির কসম।"

প্রফেসর আলি চোখ কপালে তুলে বললেন, "পাউরুটির কসম?"

"হ্যাঁ, পাউরুটির অস্তিত্ব নিয়ে তো আপনার মনে কোনো দ্বিধা নেই। পাউরুটির কসম আপনি এই ক্লাসটা নেন।"

প্রফেসর আলি আরও কিছুক্ষণ তর্ক করে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে কম্পিউটার-ঘরে হাজির হলেন। একটু পরে শোনা গেল তিনি বলছেন, "মনে করো এই ঘরে একটা দুই মিটার উঁচু তৈলাক্ত বাঁশ রয়েছে, আর তোমরা কম্পিউটারটা হাতে নিয়ে এই তৈলাক্ত বাঁশ বেয়ে উঠছ। প্রতি সেকেন্ডে তোমরা দশ সেন্টিমিটার উপরে ওঠ, কিন্তু পরের সেকেন্ডে পাঁচ সেন্টিমিটার পিছলে নেমে আস। বাঁশের উপরে উঠে যদি কম্পিউটারটা চালু করতে চাও কতক্ষণ সময় লাগবে?"

কালোমতন একজন বলল, "স্যার, বাঁশের উপরে উঠে কেন কম্পিউটার চালু করব? টেবিলের উপরেই ভাল—"

প্রফেসর আলিকে কম্পিউটারের ক্লাসে পাঠিয়ে ফারুখ বখত স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে গিয়ে আঁতকে উঠলেন। এক্ষুনি অন্য একটা ক্লাসে প্রফেসর আলির অঙ্ক শেখানোর কথা ছিল, এখন কোনো অঙ্কের শিক্ষক নেই। তিনি মাথায় হাত দিচ্ছিলেন ঠিক তখন দেখতে পেলেন তাদের খেলাধুলার শিক্ষক রুখসানা গলায় একটা হুইসেল ঝুলিয়ে যাচ্ছে, ফারুখ বখত চিৎকার করে বললেন, "রুখসানা! রুখসানা!!"

রুখসানা ছুটে এল, "কী হয়েছে?"

"একটা ঝামেলা হয়ে গেছে।"

"কী ঝামেলা?"

"ক্লাস থ্রি সেকশান বি-এর এক্ষুনি অঙ্ক ক্লাস শুরু হবে, ক্লাস নেয়ার কেউ নেই। তুমি কি নিতে পারবে ক্লাসটা?"

"আমি? কিন্তু একটু পরেই আমরা একটা ক্লাসের পি. টি. ট্রেনিং।"

"সেটা তখন দেখা যাবে। এখন তুমি ছুটে যাও এই ক্লাসে। দেরি কোরো না।"

রুখসানা চিন্তিত মুখে অঙ্ক ক্লাসে ঢুকতেই ছাত্রছাত্রীরা আনন্দে চিৎকার করে ওঠে, রুখসানাকে সবার খুব পছন্দ। নানারকম খেলাধুলা দৌড়ঝাঁপ সবকিছুতে রুখসানার খুব উৎসাহ, বাচ্চারা তাকে পছন্দ করবে বিচিত্র কী?

সবাই সমস্বরে বলল, "খেলা খেলা খেলা!"

রুখসানা বলল, "না এখন খেলা না। এখন অঙ্ক।"

"অঙ্ক?" বলা বাহুল্য সব বাচ্চার মন-খারাপ হয়ে যায়।

"হ্যাঁ অঙ্ক। এই যে আমি ব্ল্যাকবোর্ডে তোমাদের দুইটি সংখ্যা লিখে দিচ্ছি। দুইটি সংখ্যাকে কখনো করবে যোগ কখনো বিয়োগ কখনো গুণ কখনো ভাগ।"

"কেমন করে বুঝব আমরা?"

"খুব সহজ।" রুখসানা হাসিমুখে বলল, "আমি যখন শূন্যে ডিগবাজি দেব তার মানে যোগ। যদি হাত দিয়ে পায়ের পাতা ছুঁই তার মানে বিয়োগ। যদি বুকডন দিই সেটা হবে গুণ আর যখন দুই হাত পাশে ছড়িয়ে লাফ দেব তার মানে ভাগ। তোমরাও করবে আমার সাথে। আর অঙ্কের উত্তরটি কাগজে লেখার দরকার নেই—"

"তা হলে কেমন করে করব?"

"খুব সোজা! অঙ্কের উত্তরটি দেবে তোমরা লাফিয়ে। যদি উত্তর হয় দশ তা হলে দশবার লাফাবে। যদি হয় বারো তা হলে বারো বার লাফাবে—"

একটু পরেই শোনা গেল অঙ্ক ক্লাসে হুইসিল বাজছে এবং ছেলেমেয়েরা লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে দৌড়ে ঝাঁপাঝাঁপি করে অঙ্ক করছে।

রুখসানাকে অঙ্ক ক্লাসে পাঠিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু এক্ষুনি একটা খেলাধুলার ক্লাস শুরু হবে, সেখানে কাকে পাঠানো যায় ফারুখ বখত ঠিক চিন্তা করে পেলেন না। আশেপাশে কেউ নেই, তিনি জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন, দেখলেন মীর্জা মাস্টার তাঁর বিশাল শরীর নিয়ে থপথপ করে হেঁটে আসছেন। ফারুখ বখত তাড়তাড়ি জানালা দিয়ে গলা বের করে বললেন, "মীর্জা মাস্টার!

"কী হল?"

"ভিতরে ঢুকবেন না। বাইরে মাঠে থাকেন!"

"কেন?"

"আপনাকে একটা খেলাধুলার ক্লাস নিতে হবে।"

"আমার? কী বলছেন আপনি? একটু পরে আমার একটা বাংলা ক্লাস নেয়ার কথা।"

ফারুখ বখত মাথা নেড়ে বললেন, "তার কিছু-একটা ব্যবস্থা করা যাবে, এখন আপনি খেলাধুলার এই ক্লাসটা নেন। কোনো উপায় নেই।"

মীর্জা মাস্টার আরও একটা-কিছু বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু তার আগেই ছাত্রছাত্রীরা হৈচৈ করতে করতে মাঠে এসে হাজির হয়েছে!

মীর্জা মাস্টার চি চি করে বললেন, "ছাত্রছাত্রীরা, আমি এখন তোমাদের খেলাধুলা করাব।"

সব ছাত্রছাত্রী নিশ্বাস বন্ধ করে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। বড় বড় চোখের ফুটফুটে একটা মেয়ে বলল, "আপনি?"

"হ্যাঁ। প্রথমে শরীরটা একটু গরম করে নেয়া দরকার। শরীর গরম না করে খেলাধুলা শুরু করা ঠিক নয়।"

সব ছেলেমেয়ে মাথা নাড়াল, "না, ঠিক না।"

"কাজেই শরীর গরম করার জন্যে আমরা সবাই এখন স্কুলের মাঠের এক মাথা থেকে অন্য মাথায় ছুটে যাব।"

"আ-আ-আপনিও?"

"আমিও।"

উপস্থিত ছাত্রছাত্রীদের মাঝে হঠাৎ আশ্চর্য একধরনের নীরবতা নেমে এল। মীর্জা মাস্টার যতদূর সম্ভব গলা উঁচিয়ে বললেন, "রেডি ওয়ান টু থ্রি—"

ছাত্ররা তবু কেউ দৌড়ানো শুরু করল না, বিস্ফারিত চোখে মীর্জা মাস্টারের দিকে তাকিয়ে রইল। মীর্জা মাস্টার তখন নিজেই থপথপ করে তাঁর বিশাল দেহ নিয়ে দৌড়াতে শুরু করলেন। তাঁর পিছুপিছু ক্লাসের সব ছেলেমেয়েরা।

খানিকক্ষণ পর দেখা গেল মীর্জা মাস্টার মাটিতে লম্বা হয়ে শুয়ে আছেন এবং তাঁর ছাত্রছাত্রীরা তার হাত-পা ধরে তাঁকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

ফারুখ বখত বারবার নিজের ঘড়ি দেখছিলেন। এতক্ষণে ফরাসত আলির পৌঁছে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তাঁর কোনো দেখা নেই। কিছুক্ষণের মাঝেই মীর্জা মাস্টারের একটা বাংলা ক্লাস নেবার কথা, কিন্তু তাঁকে পাঠিয়েছেন খেলাধুলার ক্লাস নেয়ার জন্যে, কাউকে এখনই দরকার। হঠাৎ তার রাণুদিদির কথা মনে পড়ল, বাংলা পড়াতে রাণুদিদির কোনো সমস্যা হবার কথা নয়।

রাণুদিদির বিজ্ঞান ক্লাস উপরের তলায়। মই বেয়ে উপরে উঠে গেলেন ফারুখ বখত। কোমরে আঁচল পেঁচিয়ে একটা ছোট যন্ত্র দাঁড় করাচ্ছিলেন রাণুদিদি। ফারুখ বখতকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, "কী ব্যাপার ফারুখ সাহেব?"

"মহাসমস্যা রাণুদিদি।"

"কী সমস্যা?"

"এক্ষুনি ক্লাস টু সেকশান এ-র বাংলা ক্লাস শুরু হবে।"

"সেটা সমস্যা?"

"না। সেটা সমস্যা না। কিন্তু কোনো শিক্ষক নেই, সেটা হচ্ছে সমস্যা! আপনাকে ক্লাসটা নিতে হবে।"

"আমাকে?"

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু একটু পরে আমার বিজ্ঞান ক্লাস। আমি এই ভ্যান ডি গ্রাফ জেনারেটরটা দাঁড় করাচ্ছি, স্থির বিদ্যুতের উপর একটা লেকচার দেব।"

"সেটা যখন সময় হবে কিছু-একটা ব্যবস্থা হবে। এখন আপনি তাড়াতাড়ি আসুন।"

রাণুদিদি ইতস্তত করে বললেন, "আমি পুরোটা প্রায় দাঁড় করিয়ে ফেলেছি, এই সুইচটা টিপে একটু দেখতাম—"

"সময় নেই রাণুদিদি," ফারুখ বখত মাথা নাড়লেন।

"ঠিক আছে, তা হলে চলেন যাই।"

একটু পরে দেখা গেল রাণুদিদি ক্লাসের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি চোখে চশমাটা ঠিক করে বসিয়ে বললেন, "খোকাখুকুরা আজকে আমি তোমাদের বাংলা পড়াব।"

"বাংলা?"

"হ্যাঁ, বাংলা। বাংলা সাহিত্য। বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে বড় দিকপালের নাম কী বলো দেখি?"

বাচ্চারা সমস্বরে চিৎকার করে ওঠে, "কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।"

"ভেরি গুড! কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সাথে বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল আরও একজন মানুষের, তাঁর নাম আলবার্ট আইনস্টাইন। তোমরা আলবার্ট আইনস্টাইনের নাম শুনেছ?"

ছেলেমেয়েরা অনিশ্চিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। রাণুদিদি উৎসাহ নিয়ে বললেন, "আইনস্টাইন ছিলেন মস্ত বড় বিজ্ঞানী। তাঁর একটা খুব বড় আবিষ্কারের নাম স্পেশাল থিওরি অফ রিলেটিভিটি। সেই জিনিসটা কী কে বলতে পারবে?"

বাচ্চারা কোনো কথা না বলে চোখ বড় বড় করে রাণুদিদির দিকে তাকিয়ে রইল। রাণুদিদি হাসিমুখে বললেন, "স্পেশাল থিওরি অফ রিলেটিভিটি খুব মজার জিনিস। মনে করো তোমরা একটা রকেটে উঠেছ, রকেটের গতিবেগ আলোর গতিবেগের কাছাকাছি। সেই রকেটটা—"

রাণুদিদি বাংলা ক্লাস পড়াতে লাগলেন খুব উৎসাহ নিয়ে।

এদিকে ফারুখ বখত নিজের মাথার চুল প্রায় ছিঁড়ে ফেলছেন। এক্ষুনি বিজ্ঞান ক্লাস শুরু হবে। কিন্তু সেই ক্লাসে পড়ানোর জন্যে রাণুদিদি নেই— তাঁকে বাংলা ক্লাসে পাঠানো হয়েছে। বিজ্ঞান ক্লাস শুরু হবার পরপরই পৌরনীতির ক্লাস, যেটা তাঁর নিজের নেয়ার কথা। ফারুখ বখত কী করবেন বুঝতে পারছেন না। তিনি নিজে বিজ্ঞান ক্লাসটা নিতে পারেন কিন্তু অন্য কাউকে পৌরনীতি ক্লাসটা নিতে হবে। অন্য কেউ বলতে বাকি রয়েছে মাত্র দুইজন। স্কুলের বাবুর্চি তথা দারোয়ান তথা দপ্তরি চুন্নু মিয়া এবং স্কুলের নার্স মাথা রোজারিও। চুন্নু মিয়া খুব চৌকস মানুষ, সে যদি একটা ক্লাস পড়িয়ে ফেলতে পারে অবাক হবার কিছু নেই। তিনি একবার চেষ্টা করে দেখার চেষ্টা করলেন। জানালা দিয়ে মাথা বের করে চিৎকার করে ডাকলেন, চুন্নু মিয়া—"

চুন্নু মিয়া প্রায় সাথে সাথে ছুটে এল। ফারুখ বখত মাথা চুলকে বললেন, "তুমি তো অনেক কাজের মানুষ—"

চুন্নু মিয়া একগাল হেসে বলল, "আপনাদের দোয়া।"

"বাচ্চাদের একটা বিজ্ঞানের ক্লাস নিতে পারবে? বেশি কঠিন কিছু না, একটু আর্কিমিডিসের সূত্র—একটু নিউটনের সূত্র—"

চুন্নু মিয়া হাতজোড় করে বলল, মাপ করেন স্যার, "আমি মূর্খ মানুষ। পড়াশোনা করি নাই।"

"পড়াশোনা কর নাই?"

"না স্যার।"

ফারুখ বখত চোখ পাকিয়ে চুন্নু মিয়ার দিকে তাকিয়ে রইলেন। চুন্নু মিয়া মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, "মার্থা আপা অনেক শিক্ষিত মানুষ। মার্থা আপাকে নিয়ে আসি?"

ফারুখ বখত খানিকক্ষণ কী-একটা ভেবে বললেন, "ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি বিজ্ঞান ক্লাসটা নিতে। তুমি মার্থা আপাকে গিয়ে ডেকে আনো, বলো তাকে পৌরনীতি ক্লাসটা নিতে হবে।"

"পোড়ানীতি?"

"পোড়ানীতি না, পৌরনীতি।"

"ঐ একই কথা।" চুন্নু মিয়া এক গাল হেসে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

ফারুখ বখত হাত দিয়ে মাথার চুলগুলি ঠিক করে রওনা দিলেন। বিজ্ঞান ক্লাসে ছেলেমেয়েরা ভিড় করে দাঁড়িয়ে গল্পগুজব করছিল। ফারুখ বখতকে ঢুকতে দেখে সবাই চুপ করে গেল, ঢ্যাঙ্গামতন একজন জিজ্ঞেস করল, "স্যার আপনি?"

"হ্যাঁ। আমি। আমি আজকে তোমাদের বিজ্ঞান পড়াব।"

"সত্যি?"

"সত্যি।"

"আপনি পারবেন?"

ফারুখ বখত ভুরু কুঁচকে বললেন, "পারব না কেন?"

"কী পড়াবেন স্যার আজকে?"

"আজকে আমি তোমাদের পড়াব বিদ্যুৎ। স্থির বিদ্যুৎ।" ফারুখ বখত সবার দিকে তাকিয়ে একটু হাসার মতো ভঙ্গি করলেন। ছাত্রছাত্রীরা কেউ না হেসে ফারুখ বখতের দিকে তাকিয়ে রইল। ফারুখ বখত একটু কেশে বললেন, "বিদ্যুৎ কী তোমরা সবাই জান। বিদ্যুৎ মানে হচ্ছে ইলেকট্রিসিটি। ইলেকট্রিসিটি মানে হচ্ছে বিদ্যুৎ—" এইটুকু বলে ফারুখ বখত বুঝতে পারেন তিনি বিদ্যুৎ সম্পর্কে আর কিছুই জানেন না। হঠাৎ করে তিনি কেমন জানি বিপন্ন বোধ করতে থাকেন। তাঁর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল, তিনি কয়েকবার ঢোক গিললেন।

সামনে বসে থাকা সাদাসিধে চেহারার একটা মেয়ে বলল, "স্যার স্থির বিদ্যুৎ মানে কী?"

"স্থির বিদ্যুৎ মানে হচ্ছে যে বিদ্যুৎ স্থির। মানে যেটা নড়াচাড়া করে না।"

"বিদ্যুৎ আবার নড়াচড়া করে কেমন করে?"

ফারুখ বখত চোখে অন্ধকার দেখলেন, একটু কেশে বললেন, "তোমাদের এখন স্থির বিদ্যুৎ দেখাব।"

"স্যার স্থির বিদ্যুৎ দেখা যায়?"

"এ্যাঁ— হয়ে মানে মনে হয় দেখা যায়।" তিনি তখন টেবিলের উপর রাখা ভ্যান ডি গ্রাফ যন্ত্রের কাছে গিয়ে বললেন, "এটার নাম ভ্যান-ভ্যান-ভ্যান—"

হঠাৎ করে তিনি নামটা ভুলে গেলেন, আর সব ছেলেমেয়ে খুশিতে হেসে ফেলল। "কী সুন্দর নাম, ভ্যান ভ্যান ভ্যান!"

ফারুখ বখত বুঝতে পারলেন যতই সময় যাচ্ছে ততই তিনি গোলমাল করে ফেলছেন। জোর করে আবার একটু হেসে বললেন, "এখন তোমাদের দেখাব স্থির বিদ্যুৎ।"

ফারুখ বখত গিয়ে ছোট ভ্যান ডি গ্রাফ যন্ত্রের মডেলটির সুইচ অন করে দিলেন, সাথে সাথে ঘড় ঘড় শব্দ করে সেটা চালু হয়ে গেল। কালো রঙের একটা বেল্ট ঘুরতে থাকে কিন্তু তার বেশি কিছু নয়। সামনে বসে থাকা একজন জিজ্ঞেস করল, "স্যার স্থির বিদ্যুৎ কোথায়?"

ফারুখ বখত মাথা চুলকালেন। তিনি নিজেও জানেন না স্থির বিদ্যুৎটি কোথায়, অনিশ্চিতের মতো ভ্যান ডি গ্রাফের মডেলটির কাছে এগিয়ে গেলেন। তারপর তিনি যেটা করলেন বিজ্ঞানের সত্যিকারের শিক্ষকরা সেটা করে না, ভ্যান ডি গ্রাফের উপরের বড় গোলাকার অংশটি একটু ছুঁয়ে দেখতে চাইলেন। উপস্থিত ছেলেমেয়েরা চমৎকৃত হয়ে দেখল ভ্যান ডি গ্রাফের গোলক থেকে বিশাল একটা বিদ্যুৎ ঝলক প্রায় বজ্রপাতের মতো ফারুখ বখতের দিকে ছুটে গেল এবং ফারুখ বখত বিকট চিৎকার করে ঘরের এক কোনায় ছিটকে পড়লেন। দেয়ালে তাঁর মাথা ঠুকে গেল, প্রথম তাঁর চোখের সামনে নানা রঙের আলো খেলা করতে লাগল এবং শেষে হঠাৎ করে সবকিছু অন্ধকার হয়ে গেল।

যখন তাঁর জ্ঞান হল তখন তিনি মেঝেতে লম্বা হয়ে শুয়ে আছেন, তাঁর মুখের উপর উবু হয়ে আছেন স্কুলের নার্স মার্থা রোজারিও এবং তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে ক্লাসের সব কয়জন ছেলেমেয়ে, তাদের চোখেমুখে ঝলমল করছে হাসি। তাঁকে চোখ খুলতে দেখে কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকা একটি ছোট মেয়ে বলল, "কী সুন্দর স্থির বিদ্যুৎ, এরকম আর দেখি নাই।"

কাছাকাছি আরেকজন বলল, "আরেকবার দেখাবেন স্যার?"

মার্থা রোজারিও বললেন, "যাও ছেলেমেয়েরা সরে যাও। পিছনে যাও।"

ছেলেমেয়েরা একটু জায়গা করে দিল এবং তখন ফারুখ বখত কোনোরকমে উঠে বসলেন। কাছাকাছি কোথায় চুন্নু মিয়া দাঁড়িয়ে ছিল, এগিয়ে এসে বলল, "ভালো আছেন স্যার?"

ফারুখ বখত দেয়াল ধরে কোনোমতে উঠে দাঁড়িয়ে চুন্নু মিয়ার দিকে চোখ পাকিয়ে তাকালেন। চুন্নু মিয়া একটু ঘাবড়ে গিয়ে দুর্বল গলায় বলল, "মার্থা আপাকে বলেছিলাম পোড়ানীতি পড়ার কথা—"

ফারুখ বখত মেঘস্বরে বললেন, "পোড়ানীতি না, পৌরনীতি—"

"ঐ একই কথা স্যার। মার্থা আপা রাজি হলেন না।"

মার্থা রোজারিও কাছেই ছিলেন, নরম গলায় বললেন, "সেই কবে পড়েছি, এখন তো আর মনে-টনে নেই। ইংরেজি হলে চেষ্টা করে দেখতাম।"

ফারুখ বখত একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, "তা হলে পৌরনীতি আজ পড়া হবে না।"

মার্থা রোজারিও বললেন, "পৌরনীতির শিক্ষকটা কে ছিল?"

"আমি।"

"তা হলে আপনি কেন পড়াচ্ছেন না?"

"কারণ আমি বিজ্ঞান পড়াচ্ছি।"

"বিজ্ঞানের শিক্ষক?"

"রাণুদিদি। বাংলা পড়াচ্ছেন।"

"বাংলার শিক্ষক?"

"মীর্জা মাস্টার। ছাত্রছাত্রীদের খেলাধুলা করাচ্ছেন।"

এই সময়ে চুন্নু মিয়া মাথা নেড়ে বলল, "না স্যার। মীর্জা স্যার মাটিতে শুয়ে আছেন। সব ছেলেমেয়েরা তাকে টেনে টেনে নিচ্ছে—"

মার্থা রোজারিও বাধা দিয়ে বললেন, "মীর্জা মাস্টার কেন খেলাধুলা করাচ্ছেন? খেলাধুলার জন্যে রয়েছে রুখসানা!"

ফারুখ বখত নিশ্বাস ফেলে বললেন, "রুখসানা আজকে অঙ্ক পড়াচ্ছে।"

"কেন? অঙ্কের শিক্ষক কোথায়?"

"অঙ্কের শিক্ষক প্রফেসর আলি ছাত্রদের কম্পিউটার শেখাচ্ছেন।"

"আর কম্পিউটারের শিক্ষক?"

"মহসিন। মহসিন আজকে ইংরেজি পড়াচ্ছে।"

"কেন?"

"ইংরেজি পড়ায় ফরাসত আলি, আজকে সে আসেনি, সেইজন্যেই তো এই গোলমাল।

চুন্নু মিয়া একটু কেশে বলল, "স্যার একটা কথা—"

ফারুখ বখত একটা ছোট ধমক দিয়ে বললেন, "চুন্নু মিয়া তুমি একটু বেশি কথা বল। কাজের কথা বলছি তার মাঝে বিরক্ত করছ?"

"শুধু একটা ছোট কথা—খুবই ছোট।"

"কী কথা? তাড়াতাড়ি বলো।"

"মার্থা আপা বলেছেন তিনি ইংরেজি পড়াতে পারেন। যদি মার্থা আপাকে ইংরেজি পড়াতে দেন, তা হলে মহসিন স্যার—"

ফারুখ বখত চমকে উঠে বললেন, "চুন্নু মিয়া, তুমি শেষ পর্যন্ত একটা খাঁটি কথা বলেছ। মার্থা রোজারিও পড়াবেন ইংরেজি, তা হলে মহসিন শেখাবে কম্পিউটার, প্রফেসর আলি শেখাবেন অঙ্ক, খেলাধুলায় যাবে রুখসানা, মীর্জা মাস্টার ফিরে আসবে বাংলায়—"

মার্থা রোজারিও বললেন, "সব সমস্যার সমাধান!"

চুন্নু মিয়া একগাল হেসে বলল, "আসলে স্যার আজকের দিনটাতেই কুফা লেগেছে, এইজন্যে এত গোলমাল।"

"কুফা কেন লাগবে?"

"কোনো কোনো দিন এরকম হয়। সকালে একজন মানুষ এসেছিল মাথা কামানো তার পরেই মনে হল গোলমাল—"

ফারুখ বখত হঠাৎ ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন, "মাথা কামানো?

"জি স্যার। চুল-দাড়ি সবকিছু কামানো—"

"কী করছিল সেই মানুষ?"

"ঘুরঘুর করছিল স্কুলে।"

"কোথায় সেই মানুষ?"

"বের করে দিয়েছি স্যার। আমার সাথে চোটপাট করেছিল তখন পুলিশে হাওলা করে দিয়েছি। থানায় ধরে নিশ্চয়ই শক্ত মার দিয়েছে এখন!" চুন্নু মিয়া দাঁত বের করে হাসল।

ফারুখ বখত ঘুরে চুন্নুমিয়ার দিকে তাকালেন, মেঘস্বরে বললেন, "মানুষটা কি ফরাসত আলি ছিল?"

"ফরাসত স্যার? চুন্নু মিয়া চোখ কপালে তুলে বলল, "ফরাসত স্যার হবে কেমন করে? স্যারের এত বড় চুল-দাড়ি—"

"তুমি জান না ফরাসত আলি গরমের সময় চুল-দাড়ি সব কেটে ফেলে পুরোপুরি ন্যাড়া হয়ে যায়। জান না?"

চুন্নু মিয়ার মুখ প্রথমে ফ্যাকাশে হয়ে গেল, কিছুক্ষণেই সেখানে নীল এবং গোলাপি রঙের ছোপ দেখা গেল। তারপর হঠাৎ সে দড়াম করে মাথা ঘুরে নিচে পড়ে গেল।

মার্থা রোজারিও ছুটে গেলেন চুন্নু মিয়ার কাছে, বুকে পিঠে কান লাগিয়ে বললেন, "এখনও বেঁচে আছে।"

ফারুখ বখত বললেন, "থাকলে থাকুক, সেটা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। আগে দেখি ফরাসত আলিকে ছুটিয়ে আনতে পারি কিনা।"

ক্লাসের সব ছেলেমেয়ে এসে চুন্নু মিয়াকে ঘিরে দাঁড়াল, কমবয়সী একটা মেয়ে হাসতে হাসতে বলল, "কী মজা হচ্ছে আজ! তাই না?

অন্য সবাই মাথা নাড়ল, সত্যিই আজকে খুব মজা হচ্ছে।

৫

ফরাসত আলিকে থানা থেকে উদ্ধার করে আনার পর বেশ কিছুদিন কেটে গেছে। চুন্নু মিয়া কয়েকদিন আড়ালে আড়ালে ছিল—কিন্তু ফরাসত আলি নেহায়েৎ ভালো মানুষ— চুন্নু মিয়ার উপরে সেরকম রেগে যাননি বলে সে এখনও চাকরীতে বহাল আছে। পথচারী স্কুলের কাজকর্ম মোটামুটি ভালোই চলছে, যারা পড়াচ্ছে বা কাজ করছে সবাই তাদের কাজে বেশ অভ্যস্ত হয়ে এসেছে। ঠিক এরকম সময়ে একটা চিঠি এল। হলুদ রঙের খামে একটা সরকারি চিঠি। খামটাকে দেখে বোঝার উপায় নেই কিন্তু ভিতরের চিঠিটা পরে ফারুখ বখত আর ফরাসত আলির হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

চিঠির উপরে নানা ধরনের সংখ্যা, তারিখ এবং কটমটে লেখা, সরকারি চিঠিতে যেরকম থাকে। কাগজের মাঝামাঝি জায়গা থেকে চিঠি শুরু হয়েছে। ওপরে সম্বোধন নেই, তার বদলে লেখা, 'যাহার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য'। চিঠিটা এরকম :

> এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, গণপূর্ত বিভাগে স্থানীয় এলাকার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ চিকিৎসক আইনজীবী এবং সরকারি কর্মচারীবৃন্দ এই মর্মে অভিযোগ করিয়াছেন যে অত্র অঞ্চলে একটি বেআইনি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হইয়াছে। শিক্ষাদানের পটভূমিকায় এই প্রতিষ্ঠানটি প্রকৃতপক্ষে একটি বিপজ্জনক স্থান এবং ছাত্রছাত্রীদের প্রাণের উপর হুমকিস্বরূপ।
>
> কেন এই বেআইনি প্রতিষ্ঠানটিকে অত্র অঞ্চল হইতে সম্পূর্ণরূপে অপসারিত করা হইবে না, পত্রপাঠমাত্র সেই সম্পর্কে অত্র বিভাগকে অবহিত করিবার জন্য নির্দেশ দেয়া হইতেছে।

চিঠি এইখানে শেষ, তার নিচে নানা ধরনের সংখ্যা এবং চিহ্ন এবং একজন মানুষের স্বাক্ষর। স্বাক্ষরটি ইংরেজি বাংলা বা আরবি যে-কোনো ভাষায় হতে পারে—দেখে বোঝার কোনো উপায় নেই।

চিঠি পড়ে ফারুখ বখত বললেন, "সর্বনাশ!"

ফরাসত আলি কিছু না বলে একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। এরকম সময়ে তিনি দাড়ি চুলকাতে থাকেন, এখন সে-চেষ্টা করতে গিয়ে আবিষ্কার করলেন মুখমণ্ডল চাঁছাছোলা এবং তখন তিনি নিজের দাড়ি এবং চুলের জন্যে আরেকটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে জিজ্ঞেস করলেন, "কী লিখেছে চিঠিতে?"

ফারুখ বখত মাথা চুলকে বললেন, "ঠিক বুঝতে পারলাম না। মনে হচ্ছে খুব খারাপ চিঠি।"

ফরাসত আলি বললেন, "আমাদের দেশে বাংলা ভাষা চালু হয়ে গেছে না? সরকারি চিঠি বাংলায় লেখার কথা না?"

ফারুখ বখত গম্ভীর গলায় বললেন, "এটা বাংলা চিঠি।"

"বাংলা নাকি?" ফারুখ বখত অবাক হয়ে বললেন, "তা হলে কিছু বুঝতে পারলি না। কেন?"

"সরকারি চিঠি পড়ে কিছু বোঝা যায় না!"

"আবার পড় দেখি! আস্তে আস্তে পড়িস।"

ফারুখ বখত আস্তে আস্তে পড়লেন, কয়েকটা শব্দ এবারে আগের থেকে বেশি বোঝা গেল কিন্তু তবু অর্থ পরিষ্কার হল না। তাঁরা আন্দাজ করলেন কিছু-একটা জিনিস বেআইনিভাবে করা হচ্ছে।

ফরাসত আলি চিঠিটা নিয়ে আরও কয়েকবার পড়লেন এবং ধীরে ধীরে হঠাৎ চিঠির অর্থ পরিষ্কার হতে শুরু করল। এই এলাকার কোনো কোনো মানুষ তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে যে পথচারী স্কুল খুব বিপজ্জনক কাজেই স্কুলটা তুলে দেয়া হোক। তাঁদের এরকম চমৎকার একটা স্কুলের বিরুদ্ধে কেউ যে অভিযোগ করতে পারে সেটা ফরাসত আলি এবং ফারুখ বখত বিশ্বাস করতে পারলেন না। তারা অনেকক্ষণ চিঠির দিকে মনমরা হয়ে তাকিয়ে রইলেন, শেষে ফারুখ বখত একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, "এই স্কুলের বিরুদ্ধে যারা অভিযোগ করেছে তারা হচ্ছে শিক্ষাবিদ, আইনজীবী, চিকিৎসক আর সরকারি কর্মচারী। আমরা যদি পালটা একটা চিঠি পাঠানোর চেষ্টা করি যেখানে একজন করে শিক্ষাবিদ, আইনজীবী, চিকিৎসক আর সরকারী কর্মচারী লিখে দেয় যে স্কুলটা খুব ভার তা হলে কেমন হয়?"

ফরাসত আলি বললেন, "আইডিয়াটা মন্দ না। কিন্তু পাব কোথায় এরকম মানুষ?"

"কেন, আমাদের রইসউদ্দিন হচ্ছে অঙ্কের প্রফেসর, তাকে শিক্ষাবিদ বলে চালিয়ে দেয়া যাবে। অ্যাডভোকেট আব্দুল করিমকে আইনজীবী বলে চালিয়ে দেব। ডাক্তার তালেব আলি হবে চিকিৎসক আর আমাদের কাস্টমসের এমাজউদ্দিন হবে সরকারি কর্মচারী। কী বলিস?"

ফরাসত আলির চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, মাথা নেড়ে বললেন, "তা-ই তো, এই সহজ জিনিসটা আমার আগে মনে হয়নি। কী আশ্চর্য!"

ফারুখ বখত মাথা চুলকে বললেন, "লটারির টিকেট নিয়ে যে-ব্যাপারটা হয়েছিল সেটা কি মনে রেখেছে নাকি কে জানে!"

ফরাসত আলি হাত নেড়ে বললেন, "ধুর, এসব কি কেউ মনে রাখে নাকি? তা ছাড়া আমার কতদিনের বন্ধু। আমাদের বিপদে সাহায্য করবে না?"

"তা তো করবেই। নিশ্চয়ই করবে।"

"তা হলে চল যাই, কবে যাবি?"

"আজ বিকালেই চল।"

সেইদিনই বিকালবেলা তাঁরা তাঁদের বন্ধুর বাসায় রওনা দিলেন। অঙ্কের প্রফেসরের বাসায় গিয়ে দেখলেন কেউ নেই, সেখান থেকে গেলেন ডাক্তার তালেব আলির বাসায়। দরজায় শব্দ করতেই কাজের মেয়েটি দরজা খুলে জিজ্ঞেস করল, "কাকে চান?"

"ডাক্তার সাহেব আছেন?"

"জি আছেন। আসেন আমার সাথে।"

মেয়েটার পিছুপিছু একটা ঘরে ঢুকে দেখেন সেখানে ডাক্তার তালেব আলির সাথে আছে প্রফেসর রইসউদ্দিন, অ্যাডভোকেট আব্দুল করিম আর কাস্টমসের এমাজউদ্দিন। চারজন মাথা কাছাকাছি রেখে কী-একটা গল্প করতে করতে খিকখিক করে হাসছিলেন। এই দুজনকে দেখে তাঁরা ভূত দেখার মতো চমকে উঠলেন। প্রফেসর রইসউদ্দিন বললেন, "তো-তো তোমরা?"

"হ্যাঁ।" ফারুখ বখত একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে বললেন, "অনেকদিন খোঁজখবর নেই তোমাদের।"

ফরাসত আলি দাড়ি চুলকাতে গিয়ে থুতনি চুলকে ফেলে বললেন, "স্কুল নিয়ে খুব ব্যস্ত, অন্য কিছুতে সময় পাই না।"

তাঁর বন্ধুরা কিছু না বলে মাছের মতো চোখে তাঁদের দিকে তাকিয়ে রইলেন। ফরাসত আলি কিছু বলার না পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা ভালো আছ?"

তাঁর বন্ধুরা কথা না বলে মাথা নাড়লেন, সম্ভবত ভালোই আছে। তারপর আবার সবাই চুপ করে বসে রইলেন, বোঝা গেল তাঁদের মাঝে কথাবার্তার বিশেষ কিছু নেই।

এভাবে বেশ খানিকক্ষণ সময় কেটে যাবার পর ফারুখ বখত ঠিক করলেন কাজের কথা শুরু করবেন। একটু কেশে বললেন, "আমরা একটু কাজে তোমাদের কাছে এসেছি।"

"কী কাজ?"

"তোমরা তো নিশ্চয়ই জান আমরা গরিব বাচ্চাদের জন্যে একটা স্কুল খুলেছি, তাদের বেশির ভাগ এমনিতে পথে পথে ঘুরে বেড়ায় বলে নাম দিয়েছি পথচারী স্কুল। বাচ্চাদের ফ্রি পড়ানো হয়, খাওয়া দেয়া হয়, দরকার হলে চিকিৎসা করা হয়। কিন্তু মজার ব্যাপার কী জান?"

"কী?"

"কিছু মানুষ আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে।"

ফরাসত আলি মাথা নাড়লেন, "অবিশ্বাস্য ব্যাপার! এরকম একটা ভালো জিনিসের বিরুদ্ধে কেউ অভিযোগ করতে পারে!"

ফারুখ বখত বললেন, "পৃথিবীতে কত বিচিত্র ধরনের মানুষ আছে! এরা নিশ্চয়ই হিংসুটে মামলাবাজ বদমাইশ আর খচ্চর প্রকৃতির।"

হঠাৎ করে রইসউদ্দিন, আবু তালেব, এমাজউদ্দিন আর আব্দুল করিম অস্বস্তিতে একটু নড়েচড়ে বসলেন। ফারুখ বখত বললেন, "মানুষগুলির দেখা পেলে ঘুষি মেরে মনে হয় দাঁত খুলে নিতাম, কিন্তু দেখা পাওয়া মুশকিল। এরা পিছন থেকে চাকু মারে!"

ফরাসত আলি বললেন, "যা-ই হোক বদমাইশ মানুষ নিয়ে কথা বলে লাভ নেই, আমরা এসেছি অন্য কাজে।"

অনেকক্ষণ পর এডভোকেট আব্দুল করিম একটা কথা বললেন, "ভারী গলায় জিজ্ঞেস করলেন, কী কাজ?"

"যারা অভিযোগ করেছে তাদের মাঝে আছে একজন শিক্ষাবিদ, একজন আইনজীবী, একজন ডাক্তার আর একজন সরকারি কর্মচারী। তোমরা চারজনও ঠিক সেরকম। এখন তোমরা যদি একটা পালটা চিঠি লিখে বল আসলে স্কুলটাতে কোনো সমস্যা নেই। চমৎকার স্কুল, এলাকার গরিব শিশুদের উপকার হচ্ছে, তা হলে হয়তো সরকারি লোকজনের মাথাটা একটু ঠাণ্ডা হবে।"

ডাক্তার তালেব আলি একটা ম্যাচ বের করে সেটা দিয়ে দাঁত খুঁটতে খুঁটতে বললেন, "কত দেবে?"

ফারুখ বখত অবাক হয়ে বললেন, "কত কী দেব?"

"টাকা।"

"টাকা?"

"হ্যাঁ, তিরিশ লাখ টাকা শুধু তোমরা দুইজন মিলে উড়িয়ে দিচ্ছ, আমাদের কিছু দেবে না?"

ফারুখ বখত আর ফরাসত আলি একজন আরেকজনের মুখের দিকে তাকালেন। প্রফেসর রইসউদ্দিন মাথা নেড়ে বললেন, "হ্যাঁ, তোমাদের জন্যে একটা কাজ করে দেব, টাকা দেবে না? টাকা ছাড়া কাজ হয় আজকাল?"

ফারুখ বখত আর ফরাসত আলি অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। শেষে একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলে বললেন, "কত চাও?"

"দশ লাখ।"

"দশ লাখ?"

"হ্যাঁ।" অ্যাডভোকেট আব্দুল করিম মাথা নাড়লেন।

"একটা চিঠি লিখে দেবার জন্যে দশ লাখ? কবিগুরু সঞ্চয়িতা লিখেও দশ লাখ টাকা পাননি।"

"সেটা তোমাদের বিবেচনা।"

ফারুখ বখত উঠে দাঁড়ালেন, মাথা নেড়ে বললেন, "না, এই ধরনের কাজ টাকাপয়সা দিয়ে করানো ঠিক না। দশ লাখ দূরে থাকুক দশ টাকা দিয়েও করানো ঠিক না। শহরে আরও অনেক মানুষ আছে তারা খুশি হয়ে চিঠি লেখে দেবে।"

রইসউদ্দিন মুখ বাঁকা করে হেসে বললেন, "অন্য মানুষের চিঠি আর আমাদের চিঠির মাঝে একটা পার্থক্য আছে!"

"কী পার্থক্য?"

"অভিযোগের প্রথম চিঠিটা লিখেছিলাম আমরা।"

"তোমরা!" ফরাসত আলি লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "তোমরা?"

"হ্যাঁ। এতগুলি টাকা এইভাবে নষ্ট করছ চোখে দেখা যায় নাকি? একটা দুইটা মিনিবাস কিনে রাস্তায় নামিয়ে দিতে, তা না করে স্কুল দিয়েছ! তাও যদি ইংরেজি মিডিয়াম স্কুল হত বড়লোকের বাচ্চাদের জন্যে তা হলেও একটা কথাছিল!"

ফারুখ বখত বললেন, "ঘুষি মেরে তোমাদের চারজনেরই দাঁত খুলে নেওয়া উচিত ছিল কিন্তু আমি ভায়োলেন্স পছন্দ করি না তাই কিছু করলাম না।"

ফরাসত আলি বললেন, "মাথা-গরম করে লাভ নেই। আয় যাই এখান থেকে।"

তাঁরা ঘর থেকে বের হবার আগেই কাস্টমসের অফিসার এমজাউদ্দিন বললেন, "যাবার আগে একটা কথা শুনে যান।"

"কী?"

"কালকে আপনাদের স্কুল তদন্ত করতে আসবে।"

"কালকে?"

"হ্যাঁ।"

"তুমি কেমন করে জান?"

"পুরো ব্যাপারটা আমরা দাঁড় করালাম আর আমি জানব না? হে হে হে। যা-ই হোক, হাতে নগদ ক্যাশ টাকা রেখো।"

"নগদ ক্যাশ টাকা?"

"হ্যাঁ।"

"কেন?"

"কেন সেটা এখনও জান না? তোমার নাক টিপলে মনে হয় এখনও দুধ বের হয়!"

ফারুখ বখত ফরাসত আলির হাত ধরে টেনে বললেন, "আয় যাই এখান থেকে।"

অ্যাডভোকেট আব্দুল করিম বললেন, "আমার কথাটা একটু ভেবে দেখলে পারতে হে, খরচ কম পড়ত।"

ডাক্তার তালেব আলি বললেন, "একটা স্কুল উলটো করে দাঁড়া করিয়ে রেখেছ, তদন্ত করতে এসে সেটা যখন দেখবে তোমাদের কোনো উপায় আছে বের হবার?"

প্রফেসর রইসউদ্দিন হিহি করে হেসে বললেন, "স্কুলের মেঝে উঠে গেছে আকাশে, দরজাগুলি আড়াআড়ি, বেঞ্চ, চেয়ার, টেবিল বের হয়ে এসেছে দেয়াল থেকে, ফাজলেমির তো একটা মাত্রা থাকা দরকার!"

এমাজউদ্দিন নাক দিয়ে ফোঁৎ করে একটা শব্দ করে বললেন, "আর সেই স্কুলের ছাত্র কারা? এলাকার যত গুণ্ডাপাণ্ডা বখা ছেলেপিলে। রিকশাওয়ালার ছেলে! চোর-চামারের ছেলে! ছেঃ!"

ফারুখ বখত ফরাসত আলির হাত ধরে টেনে বের করে নিয়ে এলেন। রাস্তায় নেমে ফরাসত আলী বললেন, "আসলে তুই ঠিকই বলেছিলি।"

"কী?"

"ঘুষি মেরে দাঁতগুলি ভেঙে দেয়া উচিত ছিল।"

সন্ধেবেলা ফারুখ বখত আর ফরাসত আলি খুব মন-খারাপ করে তাঁদের ঘরে বসে ছিলেন। এখনও তাঁদের বিশ্বাস হচ্ছে না যে কোনো মানুষ শুধুমাত্র হিংসা করে তাঁদের এত সুন্দর একটা স্কুলের পিছনে লাগতে পারে। তাঁরা যখন বসে বসে লম্বা লম্বা নিশ্বাস ফেলছিলেন ঠিক তখন হারুন ইঞ্জিনিয়ার এসে হাজির হলেন, তাঁদের এভাবে বসে থাকতে দেখে বললেন, "কী হল, তোমাদের দেখে মনে হচ্ছে ছেলে মরে গেছে?"

ফরাসত আলি লম্বা একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, "অবস্থা অনেকটা সেরকমই।"

"কেন? কী হয়েছে?"

ফরাসত আলি আর ফারুখ বখত তখন পুরো ব্যাপারটা খুলে বললেন। সব শুনে হারুন ইঞ্জিনিয়ার কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, "এটা নিয়ে এত চিন্তা করার কী আছে?"

"চিন্তা করার কিছু নেই? কী বলছ? যদি স্কুল বন্ধ করে দেয়?"

"স্কুল ঠিক করে ফেলো, তা হলে বন্ধ করবে না। উলটো স্কুল সোজা করে বসিয়ে ফেলো— আমি কতদিন থেকে বলছি!"

"সময় কোথায়? কালকেই আসবে তদন্ত করতে।"

"অনেক সময় আছে। এক রাতে পুরো স্কুল খুলে আমরা লাগিয়ে দেব। মনে নেই আগেরবার কীরকম একটা ঝড়ের রাতে পুরো স্কুল বসিয়ে দিয়েছিলাম? সেই তুলনায় আজকে কী চমৎকার রাত! পরিষ্কার জোছনা। দেখতে দেখতে কাজ শেষ হয়ে যাবে।"

"সত্যি পারবে? সত্যি?" উত্তেজনায় ফারুখ বখত আর ফরাসত আলি উঠে দাঁড়ালেন।

"না পারার কি আছে! এখন তো কাজ আরও সহজ। ইচ্ছে করলে নিচের স্ক্রুগুলি খুলে পুরো স্কুলঘরটা নামিয়ে দেব। এক ঘণ্টায় কাজ শেষ।"

"তা হলে আর সময় নষ্ট করে কাজ নেই, চলো কাজ শুরু করে দিই।"

হারুন ইঞ্জিনিয়ার উঠে দাঁড়ালেন, "চলো। চুন্নু মিয়াকে ডেকে আনতে হবে, সাথে মহসিন আর রুখসানা। দুজনেই খুব কাজের মানুষ। তোমরা সবাইকে নিয়ে যাও। আমি কিছু যন্ত্রপাতি, চার্জার লাইট, কপিকল, নাইলনের দড়ি এইসব নিয়ে আসছি।"

ঘণ্টাখানেকের মাঝেই জোছনারাতে সবাই কাজ শুরু করে দিলেন। কয়েকটা চার্জার লাইট জ্বালানো হয়েছে। এক পাশে একটা কেরোসিনের চুলায় বড় কেতলিতে পানি গরম হচ্ছে চা তৈরি করার জন্যে। কাছাকাছি কোথাও একটা ক্যাসেট-প্লেয়ারে ভাওয়াইয়া গান হচ্ছে, কাজ করার সময় এরকম গান চমৎকার শোনায়।

হারুন ইঞ্জিনিয়ার বগলে কিছু কাগজ নিয়ে কাজকর্ম দেখছেন, অন্য সবাই কাজ করছে। প্রথমে ভেবেছিলেন পুরো স্কুলঘরটাই কাত করে নামিয়ে নেবেন, সাতপাঁচ ভেবে সেটা না করার সিদ্ধান্ত নিলেন। একটা একটা করে ঘর খুলে নেয়া হচ্ছে, কপিকলে বেঁধে সাবধানে সেটা নামিয়ে নেয়া হচ্ছে, তারপরে ঠেলেঠুলে সেটাকে ঠিক জায়গায় নিয়ে মাটিতে পাকাপাকিভাবে বসিয়ে দেয়া হচ্ছে। অসংখ্য বড় বড় স্ক্রু, মস্ত বড় রেঞ্চ দিয়ে খুলে ফেলছে সবাই, আবার নতুন জায়গায় গিয়ে লাগিয়ে ফেলছে। সত্যিকারের কাজ খুব বেশি নয়, কিন্তু নানারকম খুঁটিনাটি ব্যাপার হয়েছে, এইসব খুঁটিনাটি ব্যাপারেই সময় বেশি চলে যাচ্ছে। হারুন ইঞ্জিনিয়ারের হিসেবে রাত একটার মাঝে কাজ শেষ হয়ে যাবার কথা ছিল, কিন্তু কাজ শেষ হতে হতে ভোররাত হয়ে গেল।

সারারাত কাজ করে কারও গায়ে আর কোনো জোর অবশিষ্ট নেই। বাসায় ফিরে গিয়ে যে যেখানে জায়গা পেল শুয়ে টানা ঘুম।

ফারুখ বখত কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়েই উঠে পড়লেন, আজ তাঁর স্কুল তদন্তের জন্যে লোক আসার কথা। সেই লোকজন আসার আগেই তিনি স্কুলে চলে যেতে চান। দাড়ি কামিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে এসে তিনি ফরাসত আলিকে ডেকে তুললেন। তারপর দুজন কিছু খেয়ে গরম দুই কাপ চা খেয়ে স্কুলে ছুটলেন।

এতদিন স্কুলটা খাড়া উপরে উঠে গিয়েছিল, এখন সেটা নিচে নেমে এসেছে বলে দেখতে কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। কিন্তু স্কুলঘরগুলি দেখাচ্ছে চমৎকার, দেখে কে বলবে এটা এক রাতের কাজ? ফরাসত আলি আর ফারুখ বখত অবাক হয়ে দেখলেন এই সাতসকালেই সবাই এসে হাজির হয়েছে। মহসিন তার কম্পিউটারগুলি ঠিক করে সাজিয়ে রাখছে। চুন্নু মিয়া হাতে ন্যাকড়া নিয়ে ঘরের দরজা-জানালা ঘষে ঘষে পরিষ্কার করছে। রুখসানা কোমরে শাড়ি পেঁচিয়ে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে দুটি গোলপোস্ট বসাচ্ছে, কিছুদিনের মাঝেই ফুটবলের সিজন শুরু হবার কথা।

স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা এল একটু পরেই, তাদের খাড়া স্কুল হঠাৎ চিত হয়ে শুয়ে আছে দেখে তারা এত অবাক হল বলার নয়। ছোট বাচ্চারা নতুন কিছু খুব পছন্দ করে তাই তাদের খুশি দেখে কে। নতুন ধরনের স্কুলে সবাই ছোটাছুটি শুরু করে দিল।

স্কুলকে ঠিক করে বসাতে দেখে সবচেয়ে বেশি খুশি হলেন মীর্জা মাস্টার। মই বেয়ে বেয়ে ক্লাশ ঘরে ওঠা এবং আড়াআড়ি দরজা দিয়ে খুব সাবধানে ক্লাসঘরে ঢুকতে এবং বের হতে হতে তিনি ত্যক্তবিরক্ত হয়ে গেছেন। স্কুলের অন্যান্য শিক্ষকও খুব খুশি হলেন, খাড়া উপরে উঠে যাওয়ার স্কুলঘরটা সবসময়েই দুলতে থাকত, ব্যাপারটিতে অভ্যস্ত হওয়া খুব সহজ নয়।

স্কুলের তদন্ত করার জন্যে সরকারি অফিসার এলেন বেলা এগারোটার দিকে। তখন ফরাসত আলি এবং ফারুখ বখত দুজনেই বাইরে দাঁড়িয়ে তাঁদের সাইনবোর্ডটা নতুন এক

জায়গায় লাগাচ্ছিলেন। স্কুলটি এখন আর খাড়া লম্বা হয়ে উঠে যাচ্ছে না বলে সেটাকে উঁচু বাঁশে করে উপরে ঝুলিয়ে রাখার প্রয়োজন নেই। সরকারি অফিসারটিকে ফারুখ বখত এবং ফরাসত আলিকে চেনেন না, কিন্তু সাথে রইসউদ্দিন, তালেব আলি, আব্দুল করিম আর এমাজউদ্দিনকে দেখে চিনে ফেললেন। তারা যখন স্কুলঘরের কাছে এসেছে তখন তাদের মুখ মাছের মতো করে একবার খুলছে এবং বন্ধ হচ্ছে। গতকালকে বিকালেও তারা দেখেছে স্কুলটি উলটো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, এখন ম্যাজিকের মতো সোজা হয়ে গেছে! নিজের চোখকেও তারা বিশ্বাস করতে পারছে না। সরকারি অফিসার এদিকে-সেদিকে তাকিয়ে এমাজউদ্দিনের দিকে তাকিয়ে বললেন, "কোথায় সেই স্কুল?"

এমাজাউদ্দিন তোতলাতে তোতলাতে বললেন, "এ-এ-এ-এইটাই সেই স্কুল।"

"এটা উলটো কোথায়? এটা তো ঠিকই আছে!"

"তা-তা-তা-তাই তো দেখছি। কা-কা-কা-কাল বিকালেও উলটো ছিল।"

সরকারি অফিসার চোখ পাকিয়ে এমাজাউদ্দিনের দিকে তাকালেন, রেগে গিয়ে বললেন, "আমার সাথে মশকরা করেন?"

"না স্যার, ম-ম-ম-মশকরা না! সত্যিই ছিল। কালকেই উলটো ছিল। খো-খো-খো-খোদার কসম!"

"চুপ করেন।" সরকারি অফিসার প্রচণ্ড একটা ধমক দিয়ে বললেন, "আল্লাহ খোদাকে টেনে আনবেন না এখানে। গাঁজা খেয়ে হাঁটাহাঁটি করেন, নাকি চোখে দেখেন না?"

ধমক খেয়ে এমাজউদ্দিন একেবারে কুঁকড়ে গেলেন, দেখে মনে হতে লাগল মাটির মাঝে মিশে যেতে চাইছেন কোনোভাবে। সরকারি অফিসার তখন অন্য তিনজনের দিকে তাকালেন, চোখ পাকিয়ে বললেন, "আপনাদের কী বলার আছে?"

রইসউদ্দিন মাথা চুলকে বললেন, "ঠিক বুঝতে পারছি না, কিছু-একটা গোলমাল আছে কোনোখানে।"

"গোলমাল তো আছেই, সেটা তো আমি জানি। নিজের চোখে দেখছি। চমৎকার একটা স্কুলের পিছনে লেগেছেন সবাই মিলে— অভিযোগ করে দিলেন স্কুলটা খাড়া আকাশে উঠে গেছে! এত সুন্দর স্কুল দেখেছেন আগে?"

ডাক্তার তালেব আলি বারকয়েক চেষ্টা করে বললেন, "আ-আ-আমরা মিথ্যা কথা বলছি না স্যার, সত্যিই স্কুলটা উলটো ছিল।"

"চুপ করেন—" সরকারি অফিসার বাজখাঁই গলায় একটা ধমক দিয়ে বললেন, "স্কুলঘর কি কেউ রাতারাতি শুইয়ে দিতে পারে? সেটাই আমাকে বিশ্বাস করতে বলেন?" অ্যাডভোকেট আব্দুল করিম ঢোক গিলে বললেন, "স্যার, আমাদের কথা বিশ্বাস না হলে অন্য কাউকে জিজ্ঞেস করে দেখেন।"

"চুপ করেন আপনি," সরকারি অফিসার প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বললেন, "আমি আমার নিজের চোখকে বিশ্বাস করব না অন্যের কথাকে বিশ্বাস করব? আমি কি আপনাদের মতো গাঁজা খেয়ে হাঁটাহাঁটি করি?"

অ্যাডভোকেট আব্দুল করিম মাছের মতো খাবি খেতে লাগলেন। সরকারি অফিসার পকেট থেকে কী-একটা কাগজ বের করে সেখানে ঘসঘস করে কী লিখে চোখ তুলে চারজনের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমি দেখে নেব আপনাদের চারজনকে। হিংসা করে মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে আমাকে হেড অফিস থেকে টেনে এনেছেন। আমাকে ভেবেছেন কী

আমার সময়ের কোনো দাম নেই? আমি কি আপনাদের মতো চব্বিশ ঘণ্টা চুকলামি করে বেড়াই? নাকি লাফাংরামি করে বেড়াই?"

চারজন মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন। সরকারি অফিসার হুংকার দিয়ে বললেন, "আপনাদের আমি জেলের ভাত খাইয়ে ছাড়ব।"

এইরকম সময় ফারুখ বখত আর ফরাসত আলি একটু এগিয়ে এলেন। সরকারি অফিসার চোখ পাকিয়ে বললেন, "আপনারা আবার কারা?"

ফারুখ বখত একটু হাসার চেষ্টা করে বললেন, "আমরা এই স্কুলটা চালাই, একটু ভিতরে এসে দেখতে চান স্যার? চালচুলোহীন বাচ্চারা কী সুন্দর পড়তে শিখেছে! একটু বড় যারা কম্পিউটারে প্রোগ্রাম করতে পারে! ইংরেজি পড়তে পারে।"

সরকারি অফিসার মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকা চারজনকে দেখিয়ে বললেন, "এই চারজন গাঁজাখোর মানুষের সাথে কথা বলে আমার দিনটাই নষ্ট হয়ে গেছে, না হলে সত্যি আমি যেতাম।"

"ভিতরে গেলে আপনার দিনটা হয়তো ভালো হয়ে যাবে।"

"নিশ্চয়ই যাবে, অবশ্যই ভালো হয়ে যাবে। কিন্তু এই নিষ্কর্মা মানুষগুলির কথায় এতদূর থেকে এখানে এসে অনেক সময় নষ্ট হয়ে গেছে, আজকে আর আসতে চাই না। আরেকদিন সময় নিয়ে আসব।"

"অবশ্যই আসবেন স্যার।"

সরকারি অফিসার লম্বা লম্বা পা ফেলে হেঁটে গিয়ে একটা জিপে উঠে চলে গেলেন।

রইসউদ্দিন, তালেব আলি, আব্দুল করিম আর এমাজউদ্দিন দাঁড়িয়ে একজন আরেকজনের দিকে চোখ পাকিয়ে তাকাতে লাগলেন। দেখে মনে হতে লাগল তাঁরা পারলে একজন আরেকজনকে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবেন।

ফারুখ বখত মুখ টিপে হেসে বললেন, "তোমরা যখন জেলের ভাত খেয়ে ফিরে আসবে তোমাদের কোনো চাকরিবাকরি থাকবে না। যদি কাজ চাও আমার কাছে এস। আমাদের স্কুলের দারোয়ানের চাকরী দিয়ে দেব!"

ফরাসত আলি সাধারণত ঠাট্টা-তামাশা করেন না, আজকে তিনিও লোভ সামলাতে পারলেন না, বাম চোখটা একটু ছোট করে বললেন, "মানুষ যেরকম করে লেখে, 'কুকুর হইতে সাবধান'— আমরা সেরকম করে লিখে দেব, 'জেলফেরত হইতে সাবধান'।"

ফরাসত আলি আর ফারুখ বখত একে অন্যকে জাপটে ধরে হাসতে হাসতে গড়াগড়ি খেলেন, কিন্তু অন্য চারজন তার মাঝে এতটুকু রসিকতাও খুঁজে পেলেন না।

৬

এর মাঝে বেশ অনেকদিন পার হয়ে গেছে। প্রথমদিকে যেরকম সবার ধারণা ছিল ছোট ছোট বাচ্চারা হবে জ্ঞানপিপাসু এবং তারা দিনরাত পড়াশোনা করে কয়েকদিনের মাঝেই সবাই একেকজন ছোটখাটো আইনস্টাইন হয়ে বের হয়ে আসবে দেখা গেল সেটা সত্যি নয়। রাস্তাঘাটে ঘোরাঘুরি করে বড় হওয়া বাচ্চা ছেলেমেয়েদের জীবন সম্পর্কে ধারণা সম্পূর্ণ অন্যরকম। তারা সবাই জানে এই স্কুলের পুরো ব্যাপারটা বড়লোক কয়েকজন মাথা-খারাপ মানুষের খেয়াল। কয়েকদিন পরে তাদের এই খেয়াল ছুটে যাবে এবং তারা

তখন আবার আগের মতো রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়াবে। কাজেই পথচারী স্কুলের ছোট ছোট ছাত্রছাত্রী এটাকে একটা খেলা হিসেবে নিয়ে সময় কাটাতে আসছে। তবে রীতিমতো আসার জন্যেই হোক বা শিক্ষকদের উৎসাহের জন্যেই হোক বাচ্চা ছেলেমেয়েদের প্রায় সবাই মোটামুটি পড়তে শিখে গেছে। কেউ-কেউ ছোটখাট ইংরেজি পড়তে পারে, কখনো কখনো বলতেও পারে। কিন্তু মজার ব্যাপার হল এই বিদ্যাটি ঠিক কী কাজে লাগবে সে-সম্পর্কে তাদের বিন্দুমাত্র ধারণা নেই।

কাজেই পথচারী স্কুলে যাঁরা পড়ান তাঁরা সবসময় সবাইকে পড়াশোনার গুরুত্ব বোঝানোর চেষ্টা করে যাচ্ছেন। অনেক চেষ্টাচরিত্র করে মোটামুটি সব বাচ্চাকেই পড়াশোনার গুরুত্ব খানিকটা বোঝানো গেছে— কয়েকজন ছাড়া। তদের মাঝে যে এক নম্বর তার নাম কাউলা। কাউলা যে কারও নাম হতে পারে সেটা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস হবার কথা না। তবে তাকে দেখে কেউ যদি তার নাম অনুমান করার চেষ্টা করে সম্ভবত কাউলা নামটিই অনুমান করবে, কারণ এই ছেলেটির গায়ের রং কুচকুচে কালো।

রাণুদিদি প্রথম দিনেই কাউলাকে কাউলা নামে ডাকতে অস্বীকার করলেন। ভুরু কুঁচকে বললেন, "একটি বিশেষণ কার নাম হতে পারে না।"

কাউলা মাথা চুলকে রাণুদিদির দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করল রাণুদিদি তাকে বকাবকি করছেন কি না এবং যদি বকাবকি করে থাকেন তা হলে তার কারণটা কী। পরিষ্কার কিছু বুঝতে না পেরে সে দুর্বলভাবে বলল, "কিন্তু আমারে সবাই ডাকে কাউলা।"

"ডাকুক। তাতে কিছু আসে যায় না। কে তোমার এই নাম দিয়েছে? তোমার বাবা?"

"আমার বাবা নাই।"

"তা হলে মা?"

"আমার মাও নাই।"

"তা হলে তোমার এই নামের কোনো যৌক্তিকতা নেই। তোমাকে আমি নতুন নাম দেব। বলো, তোমাকে কী নামে ডাকব?"

ক্লাশে ফাজিল ধরনের একজন বলল, "ময়লা।"

নামটি সত্যি হতে পারত, তাই পুরো ক্লাস হোহো করে হেসে ওঠে। কাউলা ঘুষি পাকিয়ে ফাজিল ছেলেটিকে একবার হুমকি দিয়ে রাণুদিদির দিকে তাকাল। রাণুদিদি হাসি গোপন করে বললেন, "না, ময়লাও কারও নাম হতে পারে না। তার কারণ দুটো। এক : এটাও বিশেষণ। দুই : কোনোদিন যদি সে সাবান দিয়ে স্নান করে ফেলে তা হলে কী হবে?"

কাউলার নামটি কী হতে পারে সেটি নিয়ে খানিকক্ষণ গবেষণা হল এবং তার নতুন নামকরণ করা হল কালাম, আগের নামের কাছাকাছি যেন অভ্যস্ত হতে বেশি সময় না নেয়।

কালাম অত্যন্ত চালাক-চতুর ছেলে। তার সত্যিকারের বয়স কেউ জানে না, দেখে মনে হয় আট থেকে দশের মাঝে হবে। এই বয়সের একটা ছেলে যে এত চালু হতে পারে নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস হতে চায় না। সে যে-কোনো চলন্ত বাসে উঠে বিনা ভাড়ায় যে-কোনো জায়গায় চলে যেতে পারে, ট্রেনের ছাদে বসে সারা দেশ ঘুরে আসতে পারে। চলন্ত লঞ্চ কিংবা স্টিমার থেকে পানিতে ঝাপিয়ে পড়ে সাঁতরে তীরে চলে আসতে পারে। মাথায় বোঝা নিয়ে দোকানে দোকানে ঘুরে বেড়াতে পারে, পাইকারি দোকান থেকে এককাঁদি কলা কিনে তিনগুণ দামে বিক্রি করে ফেলতে পারে। প্রয়োজন হলে সে হাত

বাঁকা করে নুলো শিশুর ভঙ্গি করে নাকি সুরে ভিক্ষা করে কিছু অর্থোপার্জন করে ফেলতে পারে। তার মতো মারপিট বা গালিগালাজ এই এলাকায় কেউ করতে পারে না এবং শুধুমাত্র এই কারণেই এই এলাকার যাবতীয় বাচ্চারা তাকে নেতা হিসেবে মেনে নিয়েছে। এতরকম গুণ থাকার পরও পড়াশোনা নামক অত্যন্ত সহজ বিষয়টিতে সে কিছুতেই মনোযোগ দিতে পারে না। কাগজে অর্থহীন আঁকিবুকি করে কেন সেটা দেখে সবাই অর্থহীন শব্দ করে সেটাকে পড়াশোনা নাম দিয়েছে সে এখনও বুঝে উঠতে পারেনি। পুরো ব্যাপারটা তার কাছে একধরনের কৌতুক ছাড়া আর কিছু না!

প্রতিদিন সকালে কালামকে নিয়ে একধরনের ধস্তাধস্তি হয়। মীর্জা মাস্টার বলেন, "কালাম, তুমি বলো। পড়াশোনা কেন করতে হয়?"

কালাম মাথা চুলকে বলে, "স্যার ভুলে গেছি।"

মীর্জা মাস্টার হুংকার দিয়ে বলেন, "ভুলে গেছি মানে? এক্ষুনি বলো।"

কালাম মুখ কাঁচুমাচু করে বলে, "পড়াশোনা করলে মনে হয় চোখে কম দেখে। তখন চশমা পরতে হয়। আর চোখে চশমা থাকলে সবাই সালাম দেয়।"

মীর্জা মাস্টার তখন হাল ছেড়ে দিয়ে ব্ল্যাকবোর্ডে একটা বড় 'অ' লিখে বলেন, "এইটা কী?"

কালাম খানিকক্ষণ মাথা চুলকে বলে, "দেখে নৌকার মতো মনে হয় স্যার। কিন্তু ছবিটা ভালো হয় নাই। একটা পাল দেয়া দরকার ছিল।"

মীর্জা মাস্টার তখন হুংকার দিয়ে বলেন, "এইটা নৌকা না, এইটা 'অ'।"

কালাম তখন তাড়াতাড়ি মাথা নেড়ে বলে, "মনে পড়েছে স্যার। এটাই অ। অ অ অ।"

পরের দিন দেখা যায় আবার সে ভুলে গেছে।

স্কুলের পড়াশোনার অংশটা কালামের একেবারেই ভালো লাগে না, তবু সে মোটামুটি নিয়মিত আসে, কারণ পড়াশোনা ছাড়াও সেখানে আরও নানারকম দুষ্টুমি করা যায়। সে একেকদিন একেকজনের পিছনে লাগে, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের শেষ করে সে এখন বড়দের ধরেছে। গত কয়েকদিন সে যার পেছনে সময় ব্যয় করছে সে হচ্ছে চুন্নু মিয়া। চুন্নু মিয়া প্রত্যেকদিন দুপুরবেলা বাচ্চাদের খাবারের জন্যে একঝাঁকা রুটি এবং এক গামলা শবজি নিয়ে আসে। সেদিন কালামের কী মনে হল কে জানে হঠাৎ করে চুন্নু মিয়ার পায়ের মাঝে নিজের পা ঢুকিয়ে দিল। সাথে সাথে তাল হারিয়ে চুন্নু মিয়া আছাড় খেয়ে পড়ল, তার শবজি উঠে গেল আকাশে এবং নিচে নেমে আসার সময় সেগুলো এসে পড়ল তার শরীরে। তাকে দেখাতে লাগল বিশাল আধ-খাওয়া একটা শিঙাড়ার মত।

চুন্নু মিয়া মেঝে থেকে কোনোমতে উঠে ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে কালামকে ধরার চেষ্টা করল। তাকে ধরতে পারলে কী হত কেউ জানে না, কিন্তু তাকে ধরা গেল না। কিছুক্ষণের মাঝেই খবর পৌঁছে গেল ক্লাস টিচার মীর্জা মাস্টারের কাছে এবং মীর্জা মাস্টার কালামকে ডেকে পাঠালেন। মেঘস্বরে জিজ্ঞেস করলেন, "কালাম তুমি চুন্নু মিয়াকে ল্যাং মেরেছ?"

কালাম মাথা চুলকে বলল, "জি স্যার মেরেছি।"

"কেন মেরেছ?"

"কেমন জানি লোভ হল স্যার! কারও ঠ্যাং দেখলেই আমার ল্যাং মারার ইচ্ছে করে। পায়ের মাঝে কুটকুট করতে থাকে স্যার।"

"পায়ের মাঝে কুটকুট করে?" মীর্জা মাস্টার হুংকার দেওয়ার চেষ্টা করলেন কিন্তু বেশি অবাক হয়েছিলেন বলে হুংকারে জোর হল না। বললেন, "খবরদার আর যদি পা কুটকুট করে ভালো হবে না কিন্তু। আর ল্যাং মারবে?"

কালাম মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। মীর্জা মাস্টার আবার জিজ্ঞেস করলেন, "মারবে?"

"জানি না স্যার। হঠাৎ করে লোভ লেগে যায়, তখন স্যার—"

"খবরদার তুমি আর চুন্নু মিয়ার ধারেকাছে আসবে না। চুন্নু মিয়াকে তুমি আর ছুঁতে পারবে না।"

কালাম একগাল হেসে বলল, "ঠিক আছে স্যার, আমি আর চুন্নু চাচাকে ছোঁব না!"

কাজেই কালাম পরের দিন অসতর্ক চুন্নু মিয়ার পায়ের সামনে একটা কলার ছিলকে ফেলে দিয়ে তাকে আছড়ে ফেলে দিল, আগের দিন থেকে অনেক জোরে। চুন্নু মিয়া যখন তার মুণ্ডু ছিঁড়ে ফেলার জন্যে তাকে স্কুলের করিডোরে ধাওয়া করতে লাগল, কালাম তারস্বরে চিৎকার করে বলতে লাগল, "ছুঁই নাই, আমি ছুঁই নাই! খোদার কসম ছুঁই নাই!"

যে-বিষয়টিতে কাউলার অল্পকিছু উৎসাহ দেখা গেল সেটি হচ্ছে বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের সূত্রে তার সেরকম উৎসাহ নেই— তার উৎসাহ শুধুমাত্র ধ্বংসাত্মক দিকটিতে। রাণুদিদিকে সে যেসব প্রশ্ন করল সেগুলি এরকম :

বোমা বানানো কি খুব কঠিন?
ইলেকট্রিক শক দেওয়ার কোনো যন্ত্র কি আবিষ্কার হয়েছে?
ছাদের উপর থেকে নিচে কারও মাথায় ঢেলা ফেললে কী হয়?
চিমটি দিলে ব্যথা লাগে কেন?
অদৃশ্য হয়ে যাবার কোনো ওষুধ কি আবিষ্কার হয়েছে?
কারও চায়ে কেরোসিন ঢেলে দিলে কী হয়?
চুলে আগুন ধরিয়ে দিলে বোটকা গন্ধ কেন বের হয়?

বিজ্ঞানের প্রতি কালামের এই গভীর ভালোবাসা দেখে রাণুদিদির যতটুকু খুশি হওয়ার কথা ছিল খুব সংগত কারণে তিনি সেরকম খুশি হলেন না, বরং তাঁকে খুব চিন্তিত দেখা গেল!

রাণুদিদি বরাবরই তাঁর ক্লাসের ছেলেমেয়েদেরকে হাতেকলমে বিজ্ঞান শিখিয়ে এসেছেন। ক্লাসে কালামকে আবিষ্কার করার পর থেকে হঠাৎ করে হাতেকলমে বিজ্ঞান শেখানো ব্যাপারটি তিনি ভয় পেতে শুরু করেছেন। যেমন ধরা যাক, বিদ্যুৎ পরিবাহী এবং অপরিবাহীর ব্যাপারটি। যেদিন তিনি ক্লাসে বললেন পানি হচ্ছে বিদ্যুৎ পরিবাহী, তিনি আতঙ্কিত হয়ে দেখলেন সাথে সাথে কালামের মুখে একগাল হাসি ফুটে উঠল। রাণুদিদি চোখ পাকিয়ে বললেন, "কালাম, তুমি দাঁত বের করে হাসছ কেন?"

"বিজ্ঞানের একটা পরীক্ষা করব সেটা চিন্তা করে আনন্দ হচ্ছে।"

"কী পরীক্ষা?"

কালাম মাথা নেড়ে বলল, "এখন বলা যাবে না।"

"কেন বলা যাবে না?"

"এখন বললে আপনি জেনে যাবেন, তাহলে আর কোনো মজা থাকবে না?"

রাণুদিদি খুব দুশ্চিন্তায় ছিলেন এবং দেখা গেল তাঁর দুশ্চিন্তা অমূলক নয়। পরের দিন কম্পিউটারের শিক্ষক মহসিন মাথার চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে এসে জানাল কালাম এক বালতি লবণগোলা পানি এনে তার কম্পিউটারের মাঝে ঢেলে দিয়েছে। সে নাকি পানির বিদ্যুৎ পরিবাহিতা হাতেকলমে পরীক্ষা করে দেখছিল। কম্পিউটারের মনিটর থেকে আগুনের ফুলকি বের হয়ে এসে একটা বিতিকিচ্ছির ব্যাপারে ঘটেছে। কালামকে জোর করে কম্পিউটার শেখানোর ফল এরকম হলে সে ভুলেও এই পথে পা মাড়াত না!

কালামের একমাত্র সাফল্য দেখা গেল অঙ্ক ক্লাসে। পাইকারি দোকান থেকে কলা কিনে রেলগাড়ি কিংবা বাসস্টেশনে খুচরো বিক্রি করে করে সে সংখ্যা এবং যোগ-বিয়োগ খুব ভালো শিখে গেছে। তবে যে-কোনো সমস্যার উত্তর সে টাকাতে দিয়ে থাকে। যেমন, তাকে যখন বলা হয় "করিমের কাছে চারটি বই, রহিমের কাছে তিনটি বই, মোট কতটি বই?" কালাম উত্তরে বলে 'সাত টাকা'। অঙ্কের ঘাঘু শিক্ষক প্রফেসর আলি কালামের মাথা থেকে টাকা রোগ সরিয়ে সাধারণ ছাত্রে পালটানোর চেষ্টা করছেন কিন্তু এখনও খুব লাভ হয়নি। লাভ হবে সেরকম মনে হয় না।

কালামের জন্যে যে-মানুষটির কাজকর্ম খুব বেড়েছে তিনি হচ্ছেন মার্থা রোজারিও। প্রত্যেক দিনই কিছু ছেলেমেয়েকে তাঁর কাছে হাজির করা হয় যাদের হাত বা পায়ের ছাল উঠে গেছে, খানিকটা চুল ছিঁড়ে এসেছে, নাক থেকে রক্ত বের হচ্ছে, পা মচকে গেছে— কখনো কখনো আরও বেশি, এক কান দিয়ে কিছু শুনছে না কিংবা ডান পায়ে কোনো অনুভূতি নেই! এই সমস্ত রোগীর বেশিরভাগই কালামের নিজের হাতে তৈরি করা, তারা হয় কালামের নানা ধরনের পরিকল্পনায় অংশ নিয়েছে কিংবা তার দ্বৈতযুদ্ধের আহ্বানে সাড়া দিয়েছে। মার্থা রোজারিও মোটামুটিভাবে ত্যক্তবিরক্ত হয়ে আছেন, এই ছেলেটিকে কীভাবে ঠিক করা যায় তিনি ভেবে পান না। পড়াশোনা শেষ করে কোনোদিন স্কুল থেকে পাশ করে বের হয়ে যাবে তার কোনো আশা নেই, খোঁজ নিয়ে শুনেছেন সে এখনও স্বরবর্ণের প্রথম অক্ষর 'অ'-তে আটকে আছে।

মীর্জা মাস্টার যখন প্রায় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলেন যে পড়াশোনার ব্যাপারটি কালামকে বোঝানো সম্ভব নয় এবং তাকে তার স্বাধীন জীবনেই ছেড়ে দিতে হবে তখন একটা ছোট ঘটনা ঘটল। ঘটনাটি এরকম :

প্রতিদিন সকালে কালামকে স্বরবর্ণের প্রথম অক্ষর 'অ' পড়িয়ে পড়িয়ে তিনি মোটামুটি বিরক্ত হয়ে গিয়েছিলেন, তাই সেদিন তাকে দ্বিতীয় অক্ষর 'আ' শেখানোর চেষ্টা করবেন বলে ঠিক করলেন। ব্ল্যাকবোর্ডে বড় করে আ লিখে তিনি কালামকে জিজ্ঞেস করলেন, "এটা কোন অক্ষর?"

কালাম মাথা চুলকে এবং ঘাড় ঘুরিয়ে নানাভাবে অক্ষরটি পরীক্ষা করে মাথা চুলকে বলল, "আকাশে ঈদের চাঁদ উঠেছে দুইটা বাঁশগাছের মাঝে দেখা যাচ্ছে। তবে ছবিটা বেশি ভালো হয় নাই, বাঁশগাছ আরও লম্বা হয়।"

মীর্জা মাস্টার হুংকার দিয়ে বললেন, "এইটা বাঁশগাছ না। এইটা আ। বলো আমার সাথে, 'আ'।"

যে-কোনো ব্যাপার নিয়ে দুষ্টুমি করা কালামের অভ্যাস। কাজেই এবারেও সে দুষ্টুমি করে বিশাল বড় হাঁ করে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে বলল, "আ।"

ঠিক তখন সে শুনল তার কানের কাছে কোথায় জানি কট করে একটা শব্দ হল। শুধু তা-ই না, মুখটা খোলা অবস্থাতে আটকে গেল, আর বন্ধ হল না।

মীর্জা মাস্টার ধমক দিয়ে বললেন, "মুখ হাঁ করে বসে আছ কেন? বন্ধ করো।"

কালাম মিছেই তার মুখ বন্ধ করার চেষ্টা করল কিন্তু কোনো লাভ হল না, চোয়ালের কাছে কোথায় জানি পাকাপাকি ভাবে কী-একটা আটকা গেছে। এই মুখ আর বন্ধ হবে না। হঠাৎ করে, জীবনের প্রথম সে একধরনের আতঙ্ক অনুভব করে।

মীর্জা মাস্টার আবার ধমক দিলেন, "মুখ বন্ধ করো।"

কালাম নাক এবং গলা দিয়ে আঁ আঁ জাতীয় একটা শব্দ করে মাথা নেড়ে বোঝানোর চেষ্টা করল সে মুখ বন্ধ করতে পারছে না। মীর্জা মাস্টার হঠাৎ করে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে তাঁর বিশাল দেহ নিয়ে তার কাছে এলেন, চোখ কপালে তুলে বললেন, "কী হয়েছে? মুখ বন্ধ হচ্ছে না?"

কালাম মাথা নাড়ল।

"সর্বনাশ!"

ততক্ষণে ক্লাসের অন্য ছেলেমেয়েরা তাকে ঘিরে ধরেছে। দার্শনিকের মতো একজন গম্ভীর গলায় বলল, "আল্লাহ শাস্তি দিয়েছে স্যার। কালাম সাংঘাতিক পাজি—আল্লাহ সেজন্যে নিজের হাতে শাস্তি দিয়েছে।"

ফরসা করে ফুটফুটে একটা মেয়ে কালামের মুখের ভিতরে তাকিয়ে বলল, "দাঁত মাজে নাই। দাঁতে পোকা হয়েছে স্যার।"

কালামের দাঁতে পোকা দেখার জন্যে তখন আরও কয়েকজন তার কাছে এগিয়ে এল। একজন চোখ উজ্জ্বল করে বলল, "দ্যাখ দ্যাখ কালামের আলজিহ্বা দেখা যাচ্ছে!"

তখন কালামের মুখের ভিতরে তার আলজিব দেখার জন্যে আরও অনেকে ভিড় করে এল।

দার্শনিকগোছের ছেলেটি আবার তার মাথা নেড়ে বলল, "আল্লাহর কাছ থেকে কেউ ছাড়া পায় না। কালাম এই মুখ দিয়ে গালি দেয় দেখে আল্লাহ মুখের মাঝে শাস্তি দিয়েছে। মুখ আর কোনোদিন বন্ধ হবে না।"

ছোটখাট একজন উৎসুক ছেলে বলল, "হাত দিয়েও তো মারে, হাতে কিছু হবে না?"

দার্শনিক ছেলেটা গম্ভীর হয়ে বলল, "হবে। হাতপা ভেঙে লুলা হয়ে যাবে। তখন সিনেমা হলের সামনে এসে ভিক্ষা করতে হবে। আল্লাহ কাউকে ছাড়ে না।"

একটি মেয়ে অনেকক্ষণ কালামকে লক্ষ করে বলল, "রাত্রে ঘুমালে মুখে যদি ইঁদুর ঢুকে যায়?"

মীর্জা মাস্টার ধমক দিয়ে সব বাচ্চাকে সরিয়ে দিয়ে কালামকে নিয়ে ছুটলেন স্কুলের নার্স মার্থা রোজারিওর কাছে।

মার্থা রোজারিও কালামকে একনজর দেখেই ব্যাপারটা বুঝে গেলেন. এটি খুব অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। মুখের ঠিক জায়গায় চাপ দিয়ে খুব সহজেই আটকে যাওয়া চোয়াল খুলে যায়, কিন্তু তিনি এই অমূল্য সুযোগ এত সহজে হাতছাড়া করতে রাজি হলেন না। কালামকে ঘরের কোনায় একটা চেয়ারে বসিয়ে মীর্জা মাস্টার এবং অসংখ্য উৎসাহী দর্শককে বিদেয় করে দিলেন।

মুখ হাঁ করে বসে থাকতে থাকতে কালামের মুখের আশেপাশে ব্যথা করতে শুরু করছে। ব্যাপারটি কী সেটা নিয়ে ভয়টুকু তাকে কাবু করেছে আরও বেশি। এটি সত্যি যদি আল্লাহর শাস্তি হয়ে থাকে এবং ধীরে ধীরে হাতপা ভেঙে লুলা হয়ে তাকে যদি সিনেমা হলের সামনে বসে ভিক্ষা করে জীবনটা কাটিয়ে দিতে হয় তখন কী হবে ভেবে সে কোনো কূলকিনারা পাচ্ছিল না।

ভিতরে ভিতরে খানিকটা উদ্বিগ্ন হয়েও মার্থা রোজারিও মুখে হাসি ফুটিয়ে একটু পরে কালামের কাছে ফিরে এলেন, তার হাতে একটা ফর্ম। কালামকে ফর্মটা ধরিয়ে দিয়ে বললেন, "নাও, ফর্মটা ফিলআপ করো। নাম ঠিকানা বয়স, কী সমস্যা লিখে নিচে পড়ে পড়ে ঠিক জায়গায় টিক চিহ্ন দিতে থাকো।"

কালাম বলার চেষ্টা করল, আমি পড়তে পারি না। মুখ পাকাপাকি খোলা থাকায় সেখান থেকে শুধুমাত্র অ্যাঁ-অ্যাঁ জাতীয় একটা শব্দ বের হল। মার্থা রোজারিও সেটা শুনেই তার কথা বুঝে ফেলার ভান করে বললেন, "কী বললে, কলম নাই? এই নাও কলম।"

কালাম কলম হাতে নিয়ে আবার আকারে ইঙ্গিতে বোঝানোর চেষ্টা করল সে পড়তে পারে না, মার্থা রোজারিও আবার বুঝে ফেলার ভান করে বললেন, "হাতের লেখা ভালো না? কোনো সমস্যা নেই। আমি খারাপ হাতের লেখাও পড়তে পারি।"

মার্থা রোজারিও মিষ্টি করে হেসে কালামকে কাগজ-কলম হাতে বসিয়ে রেখে চলে গেলেন। কালাম তার হাতের কাগজের দিকে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল, কাগজের অর্থহীন আঁকিবুকির মাঝে কী লেখা রয়েছে না জানার জন্য এই প্রথমবার আফসোস হতে থাকে। মুখ ব্যথায় টনটন করছে, কতক্ষণ তাকে বসে থাকতে হবে এবং তারপর কী হবে চিন্তা করে তার কালঘাম ছুটতে থাকে।

মার্থা রোজারিও কিছুক্ষণের মাঝেই ফিরে এসে অবাক হবার ভান করে বললেন, "সে কী, এখনও কিছু লেখনি?"

কালাম মাথা নাড়ল। মার্থা রোজারিও বললেন, "ঠিক আছে, শুধু নামটা লেখো তা হলেই হবে। তোমার নাম তো কালাম, লেখো সেটা। আমি দেখিয়ে দিই।"

মীর্জা মাস্টার প্রায় এক বৎসর চেষ্টা করে যাকে একটা অক্ষর শেখাতে পারেননি মার্থা রোজারিও কয়েক মিনিটে তাকে তার নিজের নাম লিখতে শিখিয়ে দিলেন। তাকে আরও অনেক কিছু শেখানো যেত কিন্তু মার্থা রোজারিও তার চেষ্টা করলেন না, বাচ্চাটির কষ্ট দেখে তার নিজেরও কষ্ট হতে শুরু করেছে। হাতে তোয়ালে পেঁচিয়ে মুখের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে কোথায় জানি চেপে ধরতেই আবার কট করে শব্দ হল এবং সাথে সাথে কালামের চোয়াল দুটি খুলে গিয়ে মুখটি সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল।

কালাম তার মুখে হাত বুলাতে বুলাতে কৃতজ্ঞ চোখে মার্থা রোজারিওর দিকে তাকিয়ে বলল, "জানটা বাঁচালেন আপনি। আমি ভাবছিলাম আর মুখ বন্ধ হবে না! কেমন করে করলেন?"

"পড়াশোনা করো, বড় হয়ে ডাক্তার হও তা হলে দেখবে কেমন করে করা যায়। যাও এখন।"

কালাম সাবধানে কয়েকবার মুখ বন্ধ করে এবং খুলে পরীক্ষা করে বলল, "আমাকে শিখিয়ে দেবেন?"

"কেমন করে মুখ আটকে গেলে খুলতে হয়?"

"না।"

"তাহলে কী?"

কালাম দাঁত বের করে হেসে বলল, "কেমন করে মুখ খোলা থাকলে আটকে দিতে হয়।"

"কেন?"

"তা হলে কী মজা হবে! আমি সবার মুখ খুলে আটকে রাখব। হিঃ হিঃ হিঃ—সব মুখ হাঁ করে বসে থাকবে!"

মার্থা রোজারিও চোখ পাকিয়ে বললেন, "দুষ্টু ছেলে! আমি তা হলে তোমাকে দিয়েই শুরু করি! আসো আমার কাছে—"

সাধারণত গল্প উপন্যাসে এরকম সময় দুষ্টু ছেলেরা খুব ভালো হয়ে যায়। পড়াশোনায় মনোযোগ দিয়ে ভালো ছাত্র হয়ে বড় হয়ে দেশের উপকার করে ফেলে। কিন্তু এটা যেহেতু সত্যি ঘটনা এখানে সেরকম কিছুই হল না, কালাম দুষ্টুই থাকল। খেলার মাঠে সবাইকে ল্যাং মেরে ফেলে দিতে লাগল, ক্লাসে পাশে বসে থাকা ছেলেদের চিমটি কাটতে লাগল, পকেটে করে বিষপিপড়া এনে বন্ধুদের ঘাড়ে ছেড়ে দিতে লাগল, কোনো কারণ ছাড়াই ঝগড়া পাকিয়ে মারপিট করতে লাগল।

শুধু মীর্জা মাস্টার খুব ছোট একটু পরিবর্তন লক্ষ করলেন, কালাম শেষ পর্যন্ত পড়া শিখতে রাজি হয়েছে। কেউ বিশ্বাস করুক আর না-ই করুক, কালাম স্বরবর্ণ শেষ করে শেষ পর্যন্ত ব্যঞ্জনবর্ণে পা দিয়েছে। মনে হয় এভাবে থাকলে মাসখানেকের মাঝে পড়া শিখে যাবে।

৭

গরমটা একটু কমে আসতেই পথচারী স্কুলে একটা চিঠি এল। আন্তঃস্কুল ফুটবল প্রতিযোগিতার চিঠি, অংশ নিতে হলে এক্ষুনি চিঠি লিখে তাদের জানাতে হবে। কয়েকজনের হাত ঘুরে চিঠিটা শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছালো রুখসানার হাতে। পথচারী স্কুলের কোনো ফুটবল টিম নেই কিন্তু তাই বলে ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে না সেটা তো হতে পারে না! রুখসানা চিঠি লিখে জানিয়ে দিল তার স্কুলের দুর্ধর্ষ ফুটবলের টিম নিয়ে সে প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে আসছে।

ফুটবল টিমটা কীভাবে তৈরি করবে সেটা নিয়ে কয়েকদিন ভাবনচিন্তা করে রুখসানা একদিন খেলার মাঠে সব ছাত্রছাত্রীকে দাঁড় করিয়ে বলল, "তোমরা কারা কারা ফুটবল টিমে নাম দিতে চাও?"

স্কুলের সব ছেলেমেয়ে হাত তুলে দাঁড়াল। যাদের উৎসাহ বেশি তারা দুই হাত তুলে লাফাতে লাগল।

রুখসানা উৎসাহী অসংখ্য ছেলেমেয়ের দিকে তাকিয়ে কীভাবে তাদের মাঝে থেকে মাত্র এগারো বারোজন বেছে নেবে ভেবে পায় না। সাতপাঁচ ভেবে মাঠের মাঝখানে একটা বল রেখে বলল, "একজন একজন করে সবাই বলটাকে কিক করো, যারা সবচেয়ে দূরে নিতে পারবে তাদের মাঝে থেকে টিম তৈরি করা হবে। একেকজনের তিনটা করে চান্স!"

দেখা গেল সবচেয়ে দূরে যারা বল কিক করেছে তাদের মাঝে ছয়জন মেয়ে।

কালাম মেয়েদের দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে হেসে বলল, "মেয়েলোক কি ফুটবল খেলে? ফুটবল হচ্ছে পুরুষলোকের খেলা! খামাখা বলটাকে এত জোরে লাথি মারলে কেন?"

শক্তসমর্থ একটা মেয়ে কালামকে মুখ ভেংচে বলল, "ইচ্ছে হয়েছে মেরেছি! পরেরবার আরও জোরে মারব।"

রুখসানা গলায় হুইসিল ঝুলিয়ে এদিকে এগিয়ে আসছিল, কালাম তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "আপা, মেয়েদের সরিয়ে রাখেন না কেন? তারা তো ফুটবল খেলবে না।"

শক্তসমর্থ মেয়েটি জেদি গলায় বলল, "কেন খেলব না?"

কালাম পেটে হাত দিয়ে হাসতে হাসতে বলল, "শোনো! মেয়ে হয়ে ফুটবল খেলতে চায়! হিঃ হিঃ হিঃ—"

রুখসানা জেদি মেয়েটির চোখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ করে ঠিক করে ফেলল পথচারী স্কুলের ফুটবল টিম তৈরী হবে ছেলে আর মেয়ে দিয়ে।

খবরটি যখন স্কুলে প্রচারিত হল সবাই চোখ কপালে তুলে ফেলল। ফারুখ বখত বললেন, "ফুটবল টিমে মেয়ে? বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না?"

ফরাসত আলি বললেন, "ডানপিটে সব ছেলেদের মাঝে বাচ্চা বাচ্চা মেয়েরা খেলবে? ব্যথা পেয়ে গেলে?"

মীর্জা মাস্টার বললেন, ফুটবল ক্রিকেট এইসব খেলাই তুলে দেয়া উচিৎ। ঘরে বসে কেরাম খেলতে পারে। না হয় দাবা।

প্রফেসর আলী বললেন, "রুখসানা মেয়েটাই একটা সমস্যা। এই বয়সী মেয়েদের এরকম দায়িত্ব দেয়াই ঠিক না।"

মহসিন বলল, "একটা জিনিস বললেই তো হয় না, খেলার কমিটি মেয়েদেরকে মাঠে নামতে দেবে ভেবেছেন? কক্ষনো না!"

রাণুদিদি মুচকি হেসে বললেন, "দেশের মানুষেরা কি রেডি আছে? এটা তো বিপ্লব!"

মার্থা রোজিরও মাথা চাপড়ে বললেন, "তার মানে আমার ওষুধের বাক্স নিয়ে এখন খেলার মাঠে মাঠে যেতে হবে।"

চুন্নু মিয়া কান চুলকাতে চুলকাতে পিচিক করে থুতু ফেলে বলল, "মাইয়া লোকজনের জায়গা হল পাকঘর। এর বাইরে যাওয়া ঠিক না।"

বিকেলবেলা স্কুলে ছুটির পর সব শিক্ষক খানিকক্ষণ একসাথে বসে কথাবার্তা বলেন। সেখানে রুখসানার সাথে সবার দেখা হয়ে গেল। রুখসানা বলল, "শুনেছেন সবাই, ফুটবল টিমটা ছেলে আর মেয়ে নিয়ে তৈরি করে ফেলেছি।"

সবাই মাথা নেড়ে বলল, "শুনেছি।"

"কী মনে হয় আপনাদের?"

ফারুখ বখত কিল দিয়ে বললেন, "গ্রেট আইডিয়া! আমরা সারা দেশকে দেখিয়ে দেব আমাদের মেয়েরা ছেলেদের থেকে এক আঙুল কম না! চমৎকার কাজ করেছ তুমি! কোনো তুলনা নেই। এরকম নতুন নতুন আইডিয়া না হলে কেমন করে হবে? শোনার পর থেকে আমি একেবারে অভিভূত হয়ে আছি! চমৎকার! ফ্যান্টাস্টিক।"

রাণুদিদি বললেন, "মহসিন বলছিল ফুটবল খেলায় মেয়েদের নামানো নাকি আইন নেই—"

মহসিন টেবিলে থাবা দিয়ে বলল, "আইন না থাকলে আইন তৈরি করে নেব, ফাজলেমি নাকি?"

রুখসানা বলল, "আমি চিঠিটা দেখেছি, কোথাও লেখা নেই ফুটবল টিমে শুধু ছেলেরা খেলতে পারবে—মেয়েরা খেলতে পারবে না।"

"ভেরি গুড!" প্রফেসর আলি তাঁর চশমা ঠিক করে বললেন, "দরকার হলে আমরা হাইকোর্টে যাব। সুপ্রিম কোর্টে যাব।"

চুন্নু মিয়া কান চুলকাতে চুলকাতে পিচিক করে জানালা দিয়ে বাইরে থুতু ফেলে বলল, "দুনিয়ার সত্যিকারের কাজ খালি মেয়েলোকেরাই করতে পারে—পুরুষমানুষ কোনো কামের না!"

ফুটবল টিমের প্রথম সমস্যাটা দেখা গেল প্রথমদিন বিকালবেলা, সবাই মিলে প্র্যাকটিস শুরু করার সাথে সাথে। কালামের নেতৃত্বে টিমের ছেলে খেলোয়াড়রা এসে গম্ভীর গলায় বলল, যে-দলে মেয়েরা আছে তারা সেই দলে খেলতে রাজি নয়। কালাম ফুটবল টিমের শক্ত প্লেয়ার, সে যদি খেলতে রাজি না হয় ফুটবল টিমের শক্তি অর্ধেক কমে যাবে কাজেই ব্যাপাটি গুরুতর কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু রুখসানাকে বিচলিত হতে দেখা গেল না, উদাস গলায় বলল, "কেউ খেলতে না চাইলে তাকে তো আর জোর করে খেলানো যায় না। তোমরা না খেলতে চাইলে নাই।"

কালাম থতমত খেয়ে বলল, "ফুটবল টীমের কি হবে?"

"যে কয়জন আছে সেই কয়জন নিয়েই টিম হবে।"

"কিন্তু আপা, মার খেয়ে ভূত হয়ে যাবে। বাংলা স্কুলের ছেলেরা কীরকম ফাউল করে জানেন?"

রুখসানা মিষ্টি করে হেসে বলল, "মার খেলে খাবে। কিন্তু মার না খেয়ে কখনো কেউ বড় হয় না।"

"আপা আপনি বুঝতে পারছেন না—"

আমার বোঝার কোন দরকার নেই। তোমরা যদি টিমে থাকতে চাও মাঠের এই মাথা ওই মাথায় দুইবার দৌড়ে আস, আর যদি থাকতে না চাও বাড়ী চলে যাও, সময় নষ্ট কর না।

কালাম আবার চেষ্টা করল, "আপা মেয়েছেলেরা কখনো ফুটবল খেলে না।"

"এখন থেকে খেলবে! আর কোনো কথা আমি শুনতে চাই না।"

কালাম এবং তার দলবল বিদ্রোহ ঘোষণা করে মাঠের এক কোনায় বসে বসে চোরাকাটা চিবুতে থাকল, রুখসানা তাদের পুরোপুরি অগ্রাহ্য করে মেয়েদের নিয়েই প্র্যাকটিস শুরু করে দিল।

সে মেয়েদের মাঠের মাঝে দৌড়ে নিয়ে বেড়াল, নানাভাবে বল কিক করিয়ে অভ্যাস করাল, একজন আরেকজনকে পাস দেয়া শেখাল, হেড করা শেখাল, বল কেটে নেয়া শেখাল, বল থামানো শেখাল, কর্নার কিক করা শেখাল এবং যেই মেয়েটি গোলকিপার হবে তাকে বল ধরা শেখাল। স্কুলের মাঠে মেয়েরা বল নিয়ে ছোটাছুটি করে খেলছে দেখার জন্যে কিছুক্ষণের মাঝেই চারপাশে ছোটখাটো একটা ভিড় জমে গেল।

কালাম এবং তার দলবল কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝে গিয়েছিল রুখসানা দরকার হলে সত্যি সত্যি শুধু মেয়েদের নিয়েই খেলবে—এরকম মানুষের সাথে জেদ করে খুব লাভ নেই। তা ছাড়া মেয়েগুলিকে দেখে বোঝা যাচ্ছে তারা জানপ্রাণ দিয়ে খেলবে। মেয়েদের নিয়ে টিম হলেও টিমটা খুব খারাপ হবে না। খেলায় হেরে গেলে সব-সময় মেয়েদের দোষ দিতে পারবে, কোনোভাবে জিতে গেলে তো কথাই নেই, সব-সময় বলতে পারবে মেয়েদের নিয়েই হারিয়ে দিলাম, ছেলের টিম হলে তো কথাই ছিল না! কাজেই প্র্যাকটিসের শেষের দিকে একজন একজন করে কালাম এবং তার দলবল মাঠে নেমে এল।

খেলার প্রস্তুতি হিসেবে সবার জন্যে উজ্জ্বল রঙের জার্সি তৈরি করা হল। ছেলেদের জন্যে শার্ট, মেয়েদের জন্যে ফ্রক, সামনে বড় বড় করে লেখা পথচারী স্কুল, পিছনে খেলোয়াড়দের নম্বর।

পথচারী স্কুলের প্রথম খেলাটিই পড়ল সরকারি স্কুলের সাথে। সরকারি স্কুলের ফুটবল টিম অত্যন্ত শক্তিশালী টিম, বড় বড় অফিসারের দুধ মাখন গোশত ফলমূল খাওয়া ছেলেরা সেই স্কুলে পড়ে। তারা পড়াশোনাতে যেরকম ভালো খেলাধুলাতেও সেরকম ভালো। তাদের চেহারা ছবি কথাবার্তা আচার-আচরণও ভালো, কালাম বুঝতে পারল খেলায় জেতার সেটাই হচ্ছে একমাত্র উপায়। যেহেতু ছেলেগুলি ভদ্রগোছের প্রথমেই কড়া কড়া কয়েকটা ফাউল করে তাদের ভয় দেখিয়ে দিতে হবে। ফাউল কীভাবে করতে হয় তার দলের ছেলেরা খুব ভালো করে জানে। মেয়েদের নিয়েই হচ্ছে মুশকিল—সেটার উপর রুখসানা কোনোরকম ট্রেনিং দেয়নি। শুধু যে ফাউল করা শেখায়নি তা-ই নয়, ফাউল না করার উপর দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে বসেছে।

রুখসানা মেয়েদের যে-ক্ষতি করেছে কালাম সেটা পুনরুদ্ধার করার জন্যে একদিন বিকালে তাদের জ্ঞান দেয়ার চেষ্টা করল। দলের মেয়েদের ডেকে বলল, "আপা তোমাদের যেসব কথা বলেছে সেসব এখন ভুলে যাও। খেলায় যদি জিততে চাও আমার কথা শোনো।"

তেজি ধরনের মেয়েটা বলল, "কী কথা?"

"খেলায় জেতার জন্যে প্রথমে যে-জিনিসটা শিখতে হয় সেটা হচ্ছে ল্যাং।"

"ল্যাং?"

"হ্যাঁ, খেলা চলার পর যখনই দেখবে একজন খুব ভালো খেলছে তাকে ল্যাং মেরে ফেলে দেবে।"

তেজি ধরনের মেয়েটা ভুরু কুঁচকে বলল, "ল্যাং মেরে ফেলে দেব?"

"হ্যাঁ। ব্যাপারটা মোটেও কঠিন না। মনে আছে আমি একদিন চুন্নু মিয়াকে ল্যাং মেরে ফেলেছিলাম?" কালাম নিজের গৌরবময় অতীতের কথা চিন্তা করে অনন্দে একগাল হেসে ফেলল।

তেজি ধরনের মেয়েটা বলল, "আমরা কখনো ল্যাং মারব না।"

"মারতেই হবে!" কালাম হাতে কিল দিয়ে বলল, "যদি দেখা যায় খেলায় গোলমাল হচ্ছে তখন সবচেয়ে ভালো প্লেয়ারটাকে আউট করে দিতে হয়! এমনভাবে ল্যাং মারতে হয় যেন পা ভেঙে বসে যায়। বসাতেই হবে।"

মেয়েরা মাথা নাড়ল, "কক্ষনো না।"

কালাম অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বলল, "ঠিক আছে আমার উপরে ছেড়ে দাও, আমি ল্যাং মেরে বসিয়ে দেব।"

যেদিন ফুটবল খেলা সেদিন রুখসানা তার ফুটবল টিম নিয়ে মাঠে হাজির হয়েছে। বাচ্চাগুলিকে আজকে চেনা যায় না—উজ্জ্বল লাল এবং সাদা রঙের জার্সিতে আজকে তাদেরকে আর আলাদা করে গরিব বাচ্চা বলে বোঝা যায় না। কালামকে পর্যন্ত দেখতে মনে হচ্ছে একটি সভ্যভব্য ছেলে, মেয়েদের কথা তো ছেড়েই দেয়া যাক। ফুটফুটে চেহারায় একেকটা মেয়েকে মনে হচ্ছে বুঝি ফুলপরী।

সরকারি স্কুলের ফুটবল টিমের কোচ পথচারী স্কুলের টিম দেখে হতবাক হয়ে গেলেন। তোতলাতে তোলাতে বললেন, "এই মে-মে-মে-মেয়েরা খেলবে?"

রুখসানা মিষ্টি করে হেসে বলল, "হ্যাঁ।"

"এরা খে-খে-খে-খেলতে পারে?"

রুখসানা আরও মিষ্টি করে হেসে বলল, "পারে।"

সরকারি স্কুলের ফুটবলের শিক্ষক এতক্ষণে নিজকে সামলে নিয়েছেন, চোখমুখ লাল করে বললেন, "এটা কোন ধরনের ফাজলেমি?"

"কেন, কী হয়েছে?"

"আমি আপনাদের স্কুলের খেলার টিচারের সাথে কথা বলতে চাই।"

রুখসানা তখনও চেষ্টা করে মুখে হাসি ধরে রেখে বলল, "আমিই খেলার টিচার।"

"আপনি? আপনি একজন মেয়েমানুষ।"

এবারে রুখসানার মুখ থেকে হাসি খানিকটা মুছে গেল, বলল, "তাতে কোনো সমস্যা আছে?"

"অবশ্যিই আছে।" মানুষটি এবারে রেগেমেগে বলল, "মেয়েমানুষের জায়গা মাঠে-ঘাটে-ফুটবল ফিল্ডে না। মেয়েমানুষের জায়গা পাকঘরে। মেয়েমানুষ স্বামীর খেদমত করবে আর ঘর-সংসার করবে।"

রুখসানার মুখে যেটুকু হাসি ছিল এবারে সেটাও মুছে গেল। শক্তমুখ করে বলল, "যদি মেয়েরা অন্য কিছু করে তা হলে কী হয়?"

"কী হয় তো দেখতেই পাচ্ছেন...." লোকটা চিৎকার করে কথা বলার সময় খানিকটা থুতু বের হয়ে এল, সেই অবস্থাতেই বলল, "তা হলে মেয়েরা গোল্লায় যায়! আর তার দেখাদেখি আর অন্য দশটা মেয়ের মাথা খাওয়া হয়—আপনি যে-রকম খাচ্ছেন!"

রুখসানার মুখ হঠাৎ একেবারে পাথরের মতো শক্ত হয়ে গেল, কিন্তু সে গলা খুব ঠাণ্ডা রেখে বলল, "এবারে আমার কী মনে হয় শুনবেন?"

লোকটি থতমত খেয়ে বলল, "কী মনে হয়?"

"যে-মানুষের বুদ্ধিশুদ্ধি চিন্তাভাবনা আপনার মতো তার জায়গা হচ্ছে নর্দমা!"

লোকটি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলল, "কী বললেন?"

"আমার কথা বিশ্বাস হল না? এই দেখেন—", বলে কিছু বোঝার আগে রুখসানা এগিয়ে এসে মানুষটাকে ধরে কীভাবে কীভাবে জানি শূন্যে ছুড়ে দিল এবং সবাই অবাক হয়ে দেখল মানুষটা শূন্যে উড়ে গিয়ে কাছাকাছি একটা নর্দমাতে গিয়ে পড়ল। নর্দমার ময়লা কাদা ছিটকে এসে লোকটার চোখেমুখে লেগে তাকে দেখাতে থাকে একটি ভয়ের সিনেমার ভূতের মতো। লোকটার খানিকক্ষণ লাগল বুঝতে কী হয়েছে, যখন বুঝতে পারল তখন হাঁসফাঁস করে নর্দমা থেকে বের হয়ে আসার চেষ্টা করতে থাকে। রুখসানা কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে আবার মিষ্টি করে হেসে বলল, "মেয়েদের নিয়ে আবার যদি আজেবাজে কথা বলেন তা হলে পরের বার আপনাকে স্ট্রেচারে করে নিতে হবে।"

কালাম কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল, তার মুখ আনন্দে ঝলমল করছে। মাথা নেড়ে বলল, "আমাদের আপার সাথে তেড়িবেড়ি করা ঠিক না। বন্দুক পিস্তল যেরকম লাইসেন্স করতে হয় আপার দুইটা হাতও সেইরকম লাইসেন্স করা আছে।"

সরকারি স্কুলের ফুটবল শিক্ষকের সাথে রুখসানার ছোট ঘটনার খবরটা খুব তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ে এবং তার ফল হয় ম্যাজিকের মতো। খেলার কর্মকর্তা যারা ছিল সবাই ভান করতে থাকে ফুটবল টিমে মেয়েদের নিয়ে খেলতে আসা খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। কিছুক্ষণেই মাঠে খেলোয়াড়রা নেমে যায় এবং মাঠের চারপাশে ভিড় জমে ওঠে।

পথচারী স্কুলের ছাত্রছাত্রী শিক্ষকেরাও খেলা দেখতে এসেছে—সবাই মাঠের এক পাশে বসেছে। মার্থা রোজারিও তাঁর ওষুধপত্রের বাক্স নিয়ে এসেছেন, চুন্নু মিয়ার হাতে পানির বোতল এবং লেবুর টুকরা।

খেলা শুরু হল এবং মাঠের চারপাশের মানুষেরা অবাক হয়ে দেখল আট নয় বছরের ফুটফুটে মেয়েরা কী চমৎকার সাবলীলভাবে পায়ে বল নিয়ে ছুটে যাচ্ছে এবং গোলপোস্টের কাছে গিয়ে লম্বা কিক দিয়ে গোল করার চেষ্টা করছে। তাদের দলের ছেলেদের থেকে তারা এতটুকু খারাপ খেলছে না। শক্তসমর্থ তেজি মেয়ে, ধাক্কা খেয়ে পড়ে গিয়েও তারা পড়ে থাকছে না, স্প্রিংয়ের পুতুলের মতো আবার লাফিয়ে উঠছে।

খেলা খুব জমে উঠল। সরকারি স্কুলের ছেলেরা অনেকদিন থেকে ফুটবল খেলছে, তার তুলনায় পথচারী স্কুল নতুন। কিন্তু পথচারী স্কুলের ছেলেমেয়েদের উৎসাহ অনেক বেশি, তারা মরণপণ করে খেলছে। তাদের উৎসাহ দিচ্ছে স্কুলের সব কয়জন শিক্ষক—সব কয়জন ছাত্রছাত্রী! মীর্জা মাস্টার তাঁর বিশাল শরীর নিয়ে চিৎকার করছেন এবং মাঠের বেশিরভাগ মানুষ খেলা না দেখে তাঁকে চিৎকার করতে দেখছে। বল যখন পথচারী স্কুলের ছেলেমেয়েদের পা থেকে সরকারি স্কুলের ছেলেদের পায়ে চলে যায় তখন মীর্জা মাস্টার ধপ করে একটা চেয়ারে বসে গিয়ে মুখ হাঁ করে বড় বড় নিশ্বাস নিতে থাকেন—তখন চিৎকার শুরু করে সরকারি স্কুলের ছেলেরা। প্রথম গোলটি হল দশ মিনিটের মাথায়। সরকারি স্কুলের সেন্টার ফরোয়ার্ডের পা থেকে বল কেড়ে নিল কালাম, পাস করে দিল তেজি মেয়েটিকে, সে মাঠের একপ্রান্ত থেকে একবারে অন্যপ্রান্তে বল নিয়ে ছুটে গেল, হাফব্যাককে পাশ কাটিয়ে গোলপোস্টের কাছাকাছি এসে একটা টানা কিক। বলটা সোজা গোলপোস্টে ঢুকে গেল এবং সাথে সাথে মাঠের অসংখ্য মানুষ চিৎকার করে ওঠে—'গো-ও-ও-ও-ও ল'! মীর্জা মাস্টার তাঁর বিশাল দেহ নিয়ে থপথপ করে খানিকক্ষণ দৌড়ে বেড়ালেন এবং তাঁর সাথে যোগ দিল আরও অনেক বাচ্চা-কাচ্চা।

আবার খেলা শুরু হল। সরকারি স্কুল এবার আরও চেপে খেলছে। মেয়েদের নিয়ে তৈরি একটা দলের কাছে হেরে যাবে সেটা মেনে নেয়া খুব সোজা নয়। যারা খেলছে তারা হয়তো মেনে নিতে পারে কিন্তু নর্দমা থেকে উঠে আসা তাদের খেলার টিচার সেটা কিছুতেই মেনে নেবে না। মাঠের পাশে দাঁড়িয়ে সে তার ছেলেদের উদ্দেশে গর্জন করে যাচ্ছে।

খেলার দ্বিতীয় গোলটি দিল কালাম, গোলপোস্টের কাছে মাঠের প্রায় সব খেলোয়াড় বল নিয়ে হুটোপুটি করছিল, তার মাঝে সে হেড করে গোলপোস্টে বল ঢুকিয়ে দিল। উপস্থিত দর্শকদের চিৎকারে মনে হল আশেপাশে বাড়িঘরের জানালার কাচ ভেঙে পড়বে!

পথচারী স্কুলের উৎসাহ এবারে খুব বেড়েছে। হাফ টাইমের আগেই তারা দুই-দুইটি গোল দিয়ে দিয়েছে, এভাবে খেলে গেলে জিতে যাওয়া বিচিত্র কিছু নয়। কালাম তখন বিজয়টি নিশ্চিত করার জন্য সরকারি স্কুলের ভালো একজন সেন্টার ফরোয়ার্ডকে মাঠের মাঝামাঝি ছুটন্ত অবস্থায় পা বাঁধিয়ে ফেলে দিল। ছেলেটি পা-বেঁধে মাঠে ছিটকে পড়ে ব্যথায় চিৎকার করতে থাকে, তাকে ধরাধরি করে মাঠ থেকে সরিয়ে নেয়া হয়। রেফারি কালামকেও লাল কার্ড দেখিয়ে খেলা থেকে বের করে দিল, পরিষ্কার ফাউল, কারও কোনো দ্বিমত নেই।

ব্যথা পাওয়া ছেলেটার জায়গায় এবারে আরেকজন খেলতে আসে, পথচারী স্কুলকে একজন কম নিয়েই খেলতে হবে। খেলা শুরু হওয়ার পর দেখা গেল হঠাৎ করে পথচারী

স্কুল আরও ভালো খেলতে পারছে না। দলে একজন কম নিয়ে খেলা খুব সোজা ব্যাপার নয়। বল শুধু তাদের দিকে চেপে আসতে লাগল, তার মাঝে ছয়টি মেয়ে আর চারটি ছেলে কোনোভাবে বলটাকে আটকে রাখতে চেষ্টা করছে। কতক্ষণ আটকে রাখতে পারত কে জানে, কিন্তু তার মাঝে হাফ টাইম হয়ে গেল।

রুখসানা তার স্কুলের ছেলেমেয়েদের নিয়ে মাঠের একপাশে চলে এল, চুন্নু মিয়া সেখানে তার পানির বোতল আর লেবুর টুকরা নিয়ে এসেছে। মার্থা রোজারিও তাঁর ওষুধের বাক্স নিয়ে এসেছেন। বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েরা মুখ হাঁ করে বড় বড় নিশ্বাস নিচ্ছে। ছোটাছুটি করে তাদের মুখ লাল হয়ে আছে। ছেলেমেয়েরা মাঠে পা ছড়িয়ে বসেছে, মার্থা রোজারিও যার যেখানে কেটে ছড়ে গেছে তুলো দিয়ে ঘষে অ্যান্টিসেপটিক লাগাচ্ছেন। রুখসানা সবার দিকে তাকিয়ে বলল, "খেলায় শেষ পর্যন্ত যাই হোক না কেন, আমার কাছে তোমরা জিতে গেছ। খুব সুন্দর খেলেছ সবাই। তোমরা সবাই হচ্ছ বাঘের বাচ্চা!"

তেজি ধরনের মেয়েটা বলল, "একজন ছাড়া!"

"কে?"

"কালাম। সে হচ্ছে শেয়াল।"

সবাই ঘুরে কালামের দিকে তাকাল। কালাম ঠোঁট উলটে বলল, "একটা ছোট ফাউল করেছি আর রেফারি—"

রুখসানা বাধা দিয়ে বলল, "বাজে কথা বোলো না। তুমি যদি ফাউলটা না করতে আজকে আমরা চোখ বুজে জিতে যেতাম। এখন এদের জান নিয়ে খেলতে হবে।"

কালাম মাথা চুলকে বলল, "আমাকে তো এমনিতেই বের করে দিয়েছে। একটা ঢেলা ছুড়ব নাকি সরকারি স্কুলের টিমে? মাথায় ঠিক করে লাগাতে পারলে—"

রুখসানা শীতল চোখে কালামের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি আর একটি কথা বলেছ কি ঐ গাছটাতে বেঁধে রাখব। আমার কথা বিশ্বাস না হলে একটা কথা বলে দ্যাখো—"

কালাম ভয়ে ভয়ে একবার রুখসানার মুখের দিকে তাকাল, তারপর মুখ বন্ধ করে ফেলল, এতদিনে সে জেনে গেছে রুখসানা একটি বাজে কথাও বলে না!

পথচারী দলের ছেলেমেয়েরা মুখে পানির ঝাপটা দিয়ে লেবুর টুকরা মুখে দিয়ে একটু চুষতে-না-চুষতেই হুইসেল বেজে গেল। আবার খেলার শুরু।

পরের অংশটুকু হল একটা অত্যন্ত কঠিন খেলা। সরকারি স্কুলের দল বারবার বল নিয়ে এগিয়ে এল আর বারবার তাদের আটকে দেয়া হল। শক্ত রক্ষাব্যূহ তৈরি করে দাঁড়িয়ে রইল বাচ্চা বাচ্চা কয়েকটা ছেলেমেয়ে। রাস্তায় ঘুরে ঘুরে তারা বড় হয়, বাসায় কাজ করে, পাতা কুড়িয়ে ঘরে আনে। মানুষের সম্মান ভালোবাসা কখনো পায়নি। আজকে হঠাৎ একমাঠ ভরা মানুষ তাদের পক্ষ হয়ে চিৎকার করছে কেমন করে তার অসম্মান করে?

অনেক চেষ্টা করেও তারা আটকে রাখতে পারল না, একটি গোল হয়ে গেল। সরকারি স্কুলের সেন্টার ফরোয়ার্ড বলটি দিল রাইট আউটকে, রাইট আউট হাফ ব্যাককে পাশ কাটিয়ে ভিতরে ঢুকে গেল। গোলকিপার পায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে বল ধরার চেষ্টা করল কিন্তু লাভ হল না, ততক্ষণে বল গোলপোস্টে ঢুকে গেছে। সরকারি স্কুলের ছেলেরা আনন্দে চিৎকার করতে থাকে।

রুখসানা হাত তুলে সান্ত্বনা দেয়, এখনও তারা এক গোলে এগিয়ে আছে, কোনোমতে আর কিছুক্ষণ আটকে রাখতে পারলে তারা জিতে যাবে।

আবার খেলা শুরু হল, সময় আর কাটতে চায় না! পথচারী স্কুলের ছেলেমেয়েরা সমস্ত শক্তি নিয়ে রুখে দাঁড়াল পাহাড়ের মতো দুর্ভেদ্য একটা রক্ষাব্যূহ তৈরি করল গোলপোস্টের সামনে। সরকারি স্কুল বল নিয়ে এগিয়ে এল বারবার, কিন্তু কিছুতেই ব্যূহ ভেদ করে যেতে পারল না। পাথরের দেয়ালে অঘাত করে মানুষ যেভাবে ফিরে আসে ঠিক সেভাবে ফিরে এল সরকারি স্কুলের দল। ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে যেতে থাকে, রুখসানা নিশ্বাস বন্ধ করে বসে থাকে—আর কয়েক মিনিট, তাহলেই জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয়ে যাবে।

খেলাশেষের হুইসেল বাজামাত্রই সমস্ত মাঠের মানুষ আনন্দে চিৎকার করে ওঠে। বিশাল দেহ নিয়ে মীর্জা মাস্টার নাচতে নাচতে ছুটে এলেন মাঠে, তাঁর পিছু-পিছু প্রফেসর আলি, ফারুখ বখত আর ফরাসত আলি। মার্থা রোজারিও আর রাণুদিদি নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করতে লাগলেন। চুন্নু মিয়া আর মহসিন পানির বোতল নিয়ে ছুটে গেল মাঠে, বাচ্চাদের ঘাড়ে তুলে নিল আনন্দে!

আনন্দটি অবিশ্যি খুবই ক্ষণস্থায়ী ছিল, কারণ মীর্জা মাস্টার নাচতে নাচতে মাঠের মাঝখানে ছুটে এসে হঠাৎ নিশ্বাস আটকে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন। তাঁকে হাসপাতালে নিতে হল সেখান থেকে। অ্যাম্বুলেন্স এসেছিল বেশ তাড়াতাড়ি, কিন্তু স্ট্রেচারে করে তাঁকে তুলতে গিয়ে ষোলোজন মুশকো জোয়ানের একেবারে কালঘাম ছুটে গিয়েছিল।

প্রথমে খেলাটি জেতার পর সবাই ভেবেছিল পথচারী স্কুল বুঝি ফাইনাল সেমি-ফাইনালে উঠে যাবে, গল্প উপন্যাসে সাধারণত সেরকমই হয়। কিন্তু এটা গল্প উপন্যাস নয়, তা-ই দেখা গেল পথচারী স্কুল খুব বেশি দূর এগুতে পারল না। প্রথম খেলার পর সবাই ভেবেছিল অন্তত কালামের বুঝি একটা শিক্ষা হবে, পরের বার উলটোপালটা কিছু করবে না, কিন্তু তার কোনো শিক্ষাই হল না। পরের খেলাতেও খেলার মাঝখানে একজনের পায়ের সাথে পা বাঁধিয়ে তাকে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করল। যখন খুববেশি সুবিধে করতে পারল না তখন হঠাৎ তাকে জাপটে ধরে নাকের মাঝে একটা ঘুষি—একেবারে রক্তারক্তি অবস্থা! মনে হয় খেলাধুলার ব্যাপারটা সে এখনও বুঝে উঠতে পারেনি।

রুখসানা অবিশ্যি হাল ছেড়ে দেয়নি। সে এবারে ক্রিকেট খেলার একটা টিম তৈরি করছে। ছেলে এবং মেয়েদের নিয়ে।

পরিশিষ্ট

পথচারী স্কুলের এই গল্প আমি শুনেছি ফরাসত আলির কাছে (যখন তিনি আমাকে এই গল্প বলেছেন তখন ছিল শীতকাল, তাঁর মুখে ছিল দাড়িগোঁফের জঙ্গল)। আমি প্রথম ভেবেছিলাম তিনি বুঝি বানিয়ে বানিয়ে বলছেন (আমি নিজে বানিয়ে বানিয়ে অনেক গল্প করি তাই সব-সময় সন্দেহ হয় অন্যেরাও বুঝি তাই করছে) কিন্তু দেখা গেল তিনি আসলে একটি অক্ষরও বানিয়ে বলেননি। শুধু তাই নয়, তাঁর পকেটে স্কুলের সবার ছবি ছিল। স্কুলঘর, শিক্ষক, শিক্ষিকা, ছাত্রছাত্রী— সবার। কালামের একটা আলাদা ছবি ছিল, ঠিক ছবি তোলার সময় দুষ্টামি করে একটা লাফ দিয়েছে বলে ছবিটা ঝাপসা এসেছে, চেহারাটা বোঝা যায় না। মীর্জা মাস্টারেরও একটা ছবি ছিল, একটাতে আঁটেনি বলে দুবারে তুলতে হয়েছে।

ফরাসত আলি পথচারী স্কুলের আরও অনেক গল্প করেছেন, বিজ্ঞান পরীক্ষা নিয়ে সমস্যার গল্প, ছন্নু মিয়ার ভূতের ভয় পাওয়ার গল্প, হারুন ইঞ্জিনিয়ারের পানির ট্যাংকের গল্প, মহসিনের কম্পিউটারের পাগলামির গল্প আরও কত কী! সবগুলি এখানে লেখা হল না, তা হলে একটা বিশাল উপন্যাস হয়ে যাবে, আজকাল মানুষের বিশাল উপন্যাস পড়ার সময় কোথায়? তা,ছাড়া মনে হয় তার সবগুলি মানুষ বিশ্বাসও করবে না, মনে করবে আমি বুঝি বানিয়ে বানিয়ে বলছি।

ফরাসত আলি যাবার আগে আমাকে তাঁর স্কুলে নেমন্তন্ন করে গেছেন। ভাবছি একবার স্বচক্ষে সবাইকে দেখে আসি।

এরকম একটা স্কুল নিজের চোখে না দেখলে কেমন করে হয়?